দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কমিউনিস্টদের খুনি চেহারা দেশের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে পৃঃ ২৭

সেন মহাশয়কে কয়েকটি বিনম্র প্রশ্ন পৃঃ ১০

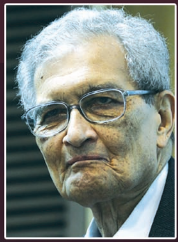

৬৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।। ১৫ ফাল্গুন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা-ভাবনা

সেবাধর্মের আদর্শ ঠাকুরের, রূপদান স্বামীজীর : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : পৃঃ ১৩

গুণীজনেরা বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বর-পুরুষ : পৃঃ ১৭

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৭ ফেব্রুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৭

খোলা চিঠি : বামপন্থীর বাবুগিরি না তৃণমূলায়ন
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৮

উত্তরপ্রদেশের ভোটে সাফল্য দেশে রাজনীতির দিগ্‌দর্শনের কম্পাস ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৯

সেন মহাশয়কে কয়েকটি বিনম্র প্রশ্ন
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১০

সাক্ষাৎকার : সেবাধর্মের আদর্শ ঠাকুরের, রূপদান স্বামীজীর
▯ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ▯ ১৩

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা
▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১৭

উপেক্ষিত হিন্দু সম্রাট হেমু
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২১

কমিউনিস্টদের খুনি চেহারা দেশের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে ▯ লোকেন্দ্র সিংহ ▯ ২৭

অসম বাজেটের জনপ্রিয় প্রস্তাবগুলি বাস্তবে কতটা কার্যকরী হবে ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ২৯

ভারতবিরোধী পাক-চীন ষড়যন্ত্র : রাশিয়ার সামিল হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৬ মার্চ
২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

লেস ক্যাশ ইণ্ডিয়া

কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাশলেস বা নগদবিহীন লেনদেনের উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা অর্থাৎ দুর্নীতিমুক্ত আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা গড়তেই ক্যাশলেস ইণ্ডিয়ার ভাবনা। সেই ভাবনা রূপায়ণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোকপাত আগামী সংখ্যায়।

বেঙ্গল
সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশ বিরোধী রাজনীতি

নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি লইয়াও ছিনিমিনি খেলিতেছে। দেশের সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাহারা সোচ্চার হইয়াছে। সেনাপ্রধান বলিয়াছিলেন, কাশ্মীর উপত্যকায় যাহারা সেনাবাহিনীর কাজে বাধা সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। গত বছর সন্ত্রাসবাদী বুরহান ওয়ানির নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সেনাদের উদ্দেশে উপত্যকার একদল মানুষ যে পাথরবৃষ্টি শুরু করিয়াছিল আজও তাহা অব্যাহত। সম্প্রতি দুইজন সন্ত্রাসবাদীর মোকাবিলা করিতে যাইয়া একজন মেজর-সহ ছয়জন সেনা শহিদ হইয়াছেন। এই সময় স্থানীয় কিছু মানুষ সেনাদের অভিযানে বাধা সৃষ্টি করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের পলাইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপত্যকার সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতাদের প্রতি ওই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সেনাপ্রধানের এই সতর্কবার্তার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির সমালোচনা—এক লজ্জাজনক বিষয়। বস্তুত ইহা অপেক্ষা আর কী লজ্জাজনক হইতে পারে। সেনাপ্রধানের এই বিবৃতি সামরিক বাহিনীর মর্যাদার সীমা লঙ্ঘন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অশনি সঙ্কেত ইত্যাদি অভিযোগ যে ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করিবার বয়ানবাজি শুধু নয়, এই ধরনের আচরণ দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকেও কলুষিত করে। সেই সঙ্গে পাকিস্তান তথা সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা প্রস্তর-নিক্ষেপকারীদের দুঃসাহসকেও প্ররোচিত করে। আর ইহাই যদি রাজনীতি হয়, তবে তাহা ক্রোধেরই সৃষ্টি করিবে। যাহারা সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার সময় সেনাদের উদ্দেশে পাথর বৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধেও তাই কঠোর পদক্ষেপ জরুরি। বস্তুত সেনাপ্রধানের বক্তব্যে আপত্তিজনক কী আছে? বিরোধীরা কি চাহিতেছেন যে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার সময় ভারত-বিরোধী স্লোগান, পাকিস্তান বা আই এস-এর পতাকা উড়ানো এবং সেনাদের উদ্দেশে পাথর বৃষ্টি চলিতে থাকুক? যদি তাহাদের উদ্দেশ্য ইহা না হয় তবে উপত্যকার ওইসব লোকেদের প্রতি হুঁশিয়ারি দেওয়া যে জরুরি, তাহা বুঝিতেছেন না কেন? স্মরণ করা যাইতে পারে, ইহার আগেও পাথর নিক্ষেপকারীরা নয়, সেনার বন্দুক তাহাদের নিশানা হইয়াছিল। বিষয়টি লইয়া তাহারা এতটাই সোচ্চার ছিল যে শেষ পর্যন্ত সংসদেও তাহা আলোচিত হইয়াছিল। তামাশা আর কাহাকে বলে! দলীয় রাজনীতি আজ এতটাই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে কাশ্মীর উপত্যকায় সেনাদের শহিদ হওয়ার দুঃখজনক ঘটনাগুলি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না।

সেনা প্রধানের বক্তব্যের বিরোধিতাকারীরা কীভাবে ভুলিয়া যাইলেন যে শুধু কাশ্মীরেই গত সপ্তাহে মেজর-সহ ছয়জন জওয়ান নিহত হইয়াছেন। যখন সেনাদের প্রতি পাথর বর্ষণকারী লোকেদের একযোগে ভর্ৎসনা করা উচিত, তখন এইসব বিরোধী নেতারা মদতকারীদের মনোবল বাড়াইতেই ব্যস্ত। এইসব নেতাদের ধিক্কার যাহারা সেনাদের শহিদ হওয়ার বিষয়ে নীরব, কিন্তু সেনাবাহিনীর কাজকর্মের সমালোচনায় সোচ্চার। তাই এইসব নেতাদের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। বরং সেনাপ্রধানের সতর্কবাণী যতশীঘ্র কার্যকর হয় তাহাই দেখিতে হইবে। এইজন্য কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলিরও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

সুভাষিতম্

অহো বত বিচিত্রাণি চরিতানি মহাত্মনাম্।

লক্ষ্মীং তৃণয়া মন্যন্তে তদ্‌ভারেণ নমন্তি চ।। (চাণক্য নীতি)

মহাত্মাদের চরিত্র বড়ই বিচিত্র। ঐশ্বর্যকে তাঁরা তৃণজ্ঞান করেন এবং তার ভারেই নত হয়ে থাকেন।

সন্ত্রাসবিরোধিতার মুখোশের আড়ালে পাকিস্তানের গজওয়া-ই-হিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ব্রাসেলস-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) সম্প্রতি একটি সমীক্ষা- রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের বন্দর শহর করাচি ভারতবিরোধী জিহাদি গোষ্ঠীগুলির প্রধানতম আড্ডা হয়ে উঠেছে। এই জিহাদিদের সমর্থক এবং প্রশ্রয়দাতা খোদ পাক সেনাবাহিনী। হাফিজ সইদের নেতৃত্বাধীন লস্কর-ই-তৈবা ও জামাত-উদ-দাওয়া, মাসুদ আজহারের নেতৃত্বাধীন জইশ-ই-মহম্মদ এবং শিয়া-বিরোধী গোষ্ঠী লস্কর-ই-ঝাংভির মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে করাচির সমস্ত মাদ্রাসার কেন্দ্রীয় স্তরে যোগাযোগ রয়েছে। জানা গেছে এইসব জঙ্গিগোষ্ঠী নিজেরাও মাদ্রাসা চালায় এবং নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের আড়ালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। পাকিস্তানের একাধিক

গজওয়া-ই -হিন্দের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের উল্লাস (ফাইলচিত্র)

প্রাক্তন সেনাকর্মী এইসব জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। তাদের প্রধান কাজ জিহাদিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাতে তারা গজওয়া-ই-হিন্দ অর্থাৎ নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ ও হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ভারত দখলের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে।

পাক সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের আড়ালে পাকিস্তানে জঙ্গি কার্যকলাপের প্রকৃত ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে, দেওবন্দি জঙ্গি আদর্শের প্রধান হোতা বিনোরি শহরের জামিয়া উলুম ইসলামিয়া এখনও তলে তলে কোনওরকম বাধা ছাড়াই জিহাদি প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে যাচ্ছে। সিন্ধ রেঞ্জের ডিরেক্টর জেনারেল যে জামিয়া বিনোরিয়া এবং করোঙ্গির জামিয়া দারুল উলুমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। সম্প্রতি ডিরেক্টর জেনারেলের তরফ থেকে জামিয়া দারুল উলুমের নেতা উসমানিকে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে। যার মর্ম : 'তোমাদের কেউ স্পর্শ করবে না।' কার্যত পাক প্রশাসনের মদতেই পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলিতে গজওয়া-ই-হিন্দ এখন বিপুল জনপ্রিয়। এ ব্যাপারে মদত রয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এরও।

এখন প্রশ্ন হলো, গজওয়া-ই-হিন্দ বলতে ইসলামিক দুনিয়া কী বোঝে? এটা একটা ইসলামি তত্ত্ব, যার প্রচলন শুধুমাত্র পাকিস্তানেই রয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী হজরত মহম্মদ নাকি ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমত এবং ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংস করার ব্যাপারেও নাকি তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। ইসলামি 'অখণ্ড ভারত' তত্ত্ব অনুযায়ী, ভারতের যেসব অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের প্রভাব সর্বাধিক সেইসব অঞ্চলকে ইসলাম ধর্মের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তবেই একটা বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব।

দেওবন্দি মাদ্রাসাগুলি এই তত্ত্বকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে। করাচি হয়ে উঠেছে জঙ্গি কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র। করাচির এক পুলিশ অফিসারকে উদ্ধৃত করা হয়েছে আইসিজি রিপোর্টে। ওই অফিসার বলেছেন, 'আইন শৃঙ্খলার দিকটা আমাদের একটু নরম করে দেখতে হয়। এছাড়া আমাদের উপায় নেই। জঙ্গিবাদ বলুন, সন্ত্রাসবাদ বলুন— এগুলো আমাদের বিদেশনীতির অঙ্গ।'

আইসিজি রিপোর্টে সন্ত্রাসবাদের প্রসারে পাক সরকারের ভূমিকাকে একেবারে নগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও ২৬/১১ মুম্বই হামলা এবং পাঠানকোট হামলায় জড়িত জঙ্গিদের হস্তান্তর করার ব্যাপারে পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ করেনি। হাফিজ সইদকে গৃহবন্দি করা হয়েছে, হাফিজ-সহ মওলানা মাসুদ আজহার, জাকি-উর-রহমান লকভিকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের আওতায় আনা হয়েছে কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যেটুকু নড়াচড়া করছে তার পিছনে রয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকা যাতে পাকিস্তানকে নিষিদ্ধ না করে বা জঙ্গিরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা না করে তার জন্যেই পাকিস্তানের এই সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান। ভারত নিয়ে মাথাব্যথা পাকিস্তানের আগেও ছিল না, এখনও নেই।

পাকিস্তানের এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমকে নিয়ে অহেতুক টালবাহানার মধ্যেও। করাচির অভিজাত ক্লিফটন অঞ্চলে দাউদ থাকেন। পাক সরকার এবং সেনাবাহিনী তাকে জামাই আদরে রেখেছে। ভারতের আদালতে প্রমাণিত হয়েছে, ৯০-এর দশকে মুম্বই সিরিয়াল ব্লাস্টিংয়ে দাউদের হাত ছিল। দাউদকে ভারতের হাতে তুলে দেবার অজস্রবার অনুরোধও করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান তাতে কান দেয়নি। দশকের পর দশক সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন জুগিয়ে পাকিস্তানের কী লাভ হয়েছে? এই তো সেদিন, শেহওয়ান শহরে লাল শাহবাজ কালান্দারের সুফি সমাবেশে আত্মঘাতী হামলায় শতাধিক মানুষ মারা গেছেন। কতবার যে পাকিস্তানের নিজের ঘরে আগুন লাগল, মুখ পুড়ল আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় তবুও পাকিস্তানের শিক্ষা হলো না।

বাংলাদেশের বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুনীল গাঙ্গুলী সবাইকেই ছাঁটাই করে দিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে বাংলাদেশ ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ তথা বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার দিন হিসাবে পালনে উল্লসিত, সেই বাংলাদেশে লেখকদের শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে তাঁদের লেখাগুলি কীভাবে কাঠছাঁট করা হচ্ছে, সম্প্রতি তা আরও একবার উঠে এসেছে। মৌলবাদীদের তোয়াজ করতে বাংলাদেশ সরকার এ যাবৎ চালু থাকা স্কুলপাঠক্রম থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বাংলাদেশ বিজড়িত কবিতা ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি’ ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ থেকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে এটি হিন্দু দেবীর গুণকীর্তন রয়েছে বলে জানিয়েছে। শরৎচন্দ্রের ‘লালু’ গল্পটিও এই সূত্রে হিন্দুদের ধর্মীয় বলি প্রদান প্রথার শিক্ষা বিষয়ক বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বহু পঠিত ‘পালামৌ’ লেখাটি ভারতের পর্যটন প্রসারে লিখিত বলে ছাঁটাই হয়েছে। তেমনি এস ওয়াজেদ আলীর ‘রাঁচি’ ভ্রমণও বাদ পড়ার কারণ রাঁচি ভারতে অবস্থিত, তাই একজন মুসলিম ছেলের সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে জানাও নিরর্থক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতাটি ভারতের আধিপত্যবাদ প্রসারে লিখিত। অন্যদিকে প্রবাদ প্রতিম শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ‘রামায়ণ কাহিনি’ হিন্দু ধর্ম প্রচার করার অভিযোগে কাটা পড়েছে। দেশে সময়ে সময়ে যুগোপযোগী করতে বহুক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমে বদল আনা হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ক্ষেত্রে মৌলবাদীরা দাবি করেছে এটি হিন্দু দেবীর মহিমা কীর্তনে লিখিত। বিশ্বকবির কবিতাটি ছাড়াও মোট ১৬টি ভারতীয় লেখদের গল্প কবিতা নির্দয়ভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই সূত্রে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী এই পরিবর্তন কেবল রুটিন বদল। অন্যদিকে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী সেখানকার কট্টরপন্থী ‘হেফাজত-এ-ইসলামের’ দাবিতেই এই বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান ইংরেজি দৈনিক ‘(Daily Star) জানাচ্ছে— অন্যকে গ্রহণ করার অনিচ্ছা থেকেই এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কমবয়সী বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের মগজ এখন মৌবাদীদের নিশ্চিন্ত পরীক্ষাগার। চরমপন্থী ইসলামপন্থীরা তাদের আক্রমণাত্মক আদর্শ ও মৌলবাদী তত্ত্ব প্রচারের তাড়না থেকেই এই কৌশল নিয়েছে বলে সংবাদপত্রগুলির অভিমত।

যদিও কলকাতার দূতাবাসের আমলা যথারীতি জানিয়েছেন— সিদ্ধান্তটি একান্তই সরকারি। এক্ষেত্রে মৌলবাদী গোষ্ঠীর কোনো ভূমিকা নেই। একই সঙ্গে কপটতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেদেশের যে কত আপন ও সম্মাননীয় সে কথা জানাতে ভোলেননি। তাদের কাজটি কিন্তু কবির পক্ষে যে চরম অশ্রদ্ধাকর হয়েছে সে কথা তাঁরা স্বীকার করছেন না। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে প্রতিবেশী দেশে এত জন বাঙালি কবি লেখদের একলপ্তে এমন পাইকারি হারে বাদ পড়ার খবর কিন্তু এবারের প্রধান বাংলা দৈনিকে সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত। ধন্য এই ব্যাপরিরা।

উবাচ

“গণতন্ত্রে কেউ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। সে তিনি অমর্ত্য সেন হোন বা গান্ধীজী।”

অমর্ত্য সেনের সমালোচনা করার কারণে সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে।

তথাগত রায়
ত্রিপুরার রাজ্যপাল

“গণহত্যা, সন্ত্রাসবাদ এবং বর্বরতার জন্য পাকিস্তানকে একঘরে করা উচিত।”

সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের নির্বিচারে ইন্ধন দেওয়া প্রসঙ্গে।

হাসানুল হক ইনু
বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী

“কাশ্মীরের যেসব মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন...আমি জানি তারা বেশিরভাগই অল্পবয়েসি...তাদের কাছে আমার অনুরোধ, তারা যদি ওরকম জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে যান, আই এস বা পাকিস্তানের পতাকা তোলেন তাহলে কিন্তু আমরা আপনাদের দেশদ্রোহী হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হব। আজ হয়তো আপনারা বেঁচে যাচ্ছেন কিন্তু একদিন আমরা আপনাদের ধরে ফেলবই। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের আপোশহীন যুদ্ধ জারি থাকবে।”

কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রতি স্থানীয় মানুষের হিংসা প্রসঙ্গে।

বিপিন রাওয়াত
ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান

“যদি কেউ নিরীহ মানুষকে হত্যা করার মতো জঘন্য অপরাধ করেন তাহলে তার পরিবার বা পারিবারিক দায়দায়িত্বের কথা বলা সাজে না। সন্তানের কথা বলা সাজে না। এইসব ঘাতকদের বেল পাওয়ার কোনো অধিকার নেই।”

জেলবন্দি সন্ত্রাসবাদীদের প্যারলে মুক্তি দেওয়ার নৈতিকতা প্রসঙ্গে।

জে. এস. কেহর
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

বামপন্থীর বাবুগিরি না তৃণমূলায়ন

মাননীয় সীতারাম ইয়েচুরি
সাধারণ সম্পাদক, সিপিআইএম
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা
কমরেড,

কলকাতা অফিসের ঠিকানাতেই পাঠালাম চিঠি। আর যাই হোক আপনি তো এই রাজ্যেরই সাংসদ। আপনি আপনার সতীর্থ সাংসদের বাবুগিরি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভাল করেছেন। কিন্তু তিনি যদি বলেন, আপনার মতো নেতার কাছ থেকেই তিনি এই বাবুগিরি শিখেছেন তবে সেটা খুব ভুল হবে কি! একবার ভেবে দেখেছেন আপনারা যাঁরা সর্বভারতীয় সিপিএম নেতা তাঁদের আচরণে কোনো কমরেড সুলভ আচরণ রয়েছে কি! আপনাদের জীবনযাপন যে কংগ্রেসি বাবুদেরও লজ্জা দেয়।

খবরে প্রকাশ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কে জড়িয়ে পড়া দলীয় সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে অনুমোদন করে না সিপিএম। এমনকী, শাস্তির মুখেও পড়তে পারেন সিপিএমের এই তরুণ সাংসদ। আপনি জানিয়েছেন, 'পলিটব্যুরোতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা বিষয়টি অনুমোদন করে না। এটা দলের আদর্শ এবং অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হবে।'

আপনি দলের সাধারণ সম্পাদক যখন প্রকাশ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তখন শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে ঋতব্রতকে। সেক্ষেত্রে এই সাংসদকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা অথবা সেন্সর করা হতে পারে। রাজ্য কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে যদি 'ঝড়' ওঠে তাহলে সাসপেন্ডও হতে পারেন ঋতব্রত। কিন্তু ঠিক কী অপরাধ করেছেন তরুণ সাংসদ। সিপিএম-এ চকোলেট বয় হিসেবে পরিচিত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধটা ঠিক কী?

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ঋতব্রত। পারিষদ দল নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবুরা একা ঘোরেন না। পরে গ্যালারিতে বসে থাকার একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি। সেখানে দেখা যায়, ঋতব্রতের হাতে একটি ঘড়ি এবং জহরকোটের বুক পকেটে একটি পেন রয়েছে। সেই ছবির নীচে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তোলেন, সিপিএমের সর্বক্ষণের কর্মী কী করে এত দামি পেন এবং ঘড়ি ব্যবহার করেন? ওই ব্যক্তির অফিসের কর্মীনিয়োগ দপ্তরে অভিযোগ জানান ঋতব্রত। ওই ব্যক্তির চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যায়। শোনা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি নিজেও একজন সিপিএম কর্মী। দলের নেতার হাতে লক্ষ টাকার ঘড়ি, বুকে ৫০ হাজারি পেন এবং এক লাখি মোবাইল ফোন নিয়ে তাঁর প্রশ্ন তোলা উচিত কিনা সেটা সিপিএম ঠিক করতেই পারে। কিন্তু একজন সাংসদ এই প্রশ্ন তোলার জন্য কারোর চাকরি খাওয়ার হুমকি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ করতে পারে কী! সিপিএম তো বাক স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে। দেশদ্রোহী বক্তব্য রাখার পরেও জেএনইউ-এর কানাইয়াকুমারকে মাথায় করে নাচে।

সীতারামবাবু, সিপিএমের অন্দরে ঋতব্রত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত। বুদ্ধবাবুর ইচ্ছাতেই তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল সিপিএম। আপনাদের দলে কিন্তু অনেক বাবু। জ্যোতি থেকে বুদ্ধ, সূর্য থেকে সীতরাম সকলেই যে 'বাবু'।

কলম বা হাতঘড়ি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। সেগুলির দাম নিয়ে প্রশ্ন তুলে ব্যক্তিগত আক্রমণ রুচিসম্মত নয়। সিপিএম সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে, তা একপ্রকার সঙ্কীর্ণ রাজনীতিই। অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ রাজনীতিক সাধারণত এ ধরনের বিষয়কে এড়িয়ে যান। কিন্তু ঋতব্রত তো আর যে-সে রাজনীতিক নন! তিনি বামপন্থী। আসলে সীতারামবাবু, আপনার দল সিপিএম বহু দশক আগেই তার বামপন্থী ভাবমূর্তিটি হারিয়েছে। ক্ষমতা মানুষ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করেছে বামেদের। কিন্তু বামপন্থী মুখোশটি তো পরিত্যাগ করা যায় না! ওই ব্যক্তির অভিযোগ তাই ঋতব্রতর গায়ে লেগেছে। আক্রান্ত হয়েছে তাঁর সর্বহারা ভাবমূর্তি। জামায় কালি লাগলে ধুয়ে ফেলা যায়। কিন্তু কালি মনে গেঁথে গেলে তা দুরপনেয় হয়। ঋতব্রতের অবস্থাও খানিক তেমন। অভিযোগের যুক্তিপূর্ণ উত্তর সাজাতে পারতেন তিনি। অভিযোগকারীর সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হতে পারতেন। ঋতব্রত করলেন ঠিক উল্টো কাজ। আইন, যুক্তির তোয়াক্কা না-করে ওই ব্যক্তির কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানালেন। কেন? যাতে তাঁর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগকারী চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ঘটনাটির সঙ্গে ওই ব্যক্তির চাকরিস্থলের সম্পর্ক কোথায়?

সিপিএম কোনোদিনই স্বাভাবিক যুক্তিশৃঙ্খলে বিশ্বাস রাখেনি। নিজেদের প্রভাব এবং ক্ষমতা নিয়ে বরাবরই তারা সরব। ক্ষমতায় থাকাকালীন পাড়ায় পাড়ায় লোকাল কমিটি, ক্লাব ঠিক এই কাজটিই করত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ঘটনাতেও হস্তক্ষেপ করত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। তৃণমূল কংগ্রেস এখন সর্বতোভাবে আপনাদের নকল করে। তাই একটু আধটু তৃণমূলকে নকল করলে দোষ কোথায়? বাম- পন্থীদের তৃণমূলায়নটা হজম করতে শিখুন।

—সুন্দর মৌলিক

উত্তরপ্রদেশের ভোটে সাফল্য দেশের রাজনীতির দিগ্‌দর্শনের কম্পাস

গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজনৈতিক ভাবে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। মোট সাত দফায় রাজ্য বিধানসভার ৪০৩টি আসনের ভোট। খ্যাতনামা মহিলা সাংবাদিক মৃণাল পাণ্ডে সম্প্রতি তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে উত্তরপ্রদেশের ভোটযুদ্ধকে মহাভারতের ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধে ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের ভোটযুদ্ধ শুধু সেই রাজ্যেরই নয়, দেশের সার্বিক রাজনীতিতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসকদল বিজেপির লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সংসদের রাজ্যসভায় নেই। তাই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিল বিরোধীরা রাজ্যসভায় আটকে দিচ্ছে। প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলের নিজস্ব অ্যাজেন্ডা থাকে। ক্ষমতা দখলের পর সেই কর্মসূচি কার্যকর করতে গেলে যদি প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করা হয় তবে প্রশাসন চলতে পারে না। চলতি বিধানসভার ভোটে উত্তরপ্রদেশে যদি বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তবে অদূরভবিষ্যতে রাজ্যসভাতেও দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনকী পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির পছন্দের প্রার্থী জয়ী হবেন। কিন্তু সফল না হলে? ব্যর্থতার দায় নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। দলের ভেতর থেকেই গুঞ্জন উঠবে যে 'নোট বাতিল' নীতি এবং অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার জন্যই ভোটে বিপর্যয় ঘটেছে।

প্রায় ২০ কোটি মানুষের রাজ্য উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মুসলমান ভোট। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে এই ২০ শতাংশ ভোটদাতারা রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষের রাজনৈতিক ভাগ্য স্থির করে থাকেন। কারণ, রাজ্যের ৮০ শতাংশ ভোটদাতারা জাতপাতের ভিত্তিতে বিভক্ত এবং ফলে শক্তিহীন। মুসলিমরা এককাট্টা হয়ে ভোট দেন। কখনও সমাজবাদী পার্টির সাইকেল চিহ্নে আবার পরিস্থিতি বুঝে মায়াবতীর হাতি প্রতীকে। বিজেপি নেতৃত্ব কী বলবেন আমি জানি না তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় উত্তরপ্রদেশের মুসলমান ভোটারদের কেউ বিজেপিকে ভোট দেয় না। মুসলমানদের চোখে বিজেপি হিন্দুদের পার্টি। রাম ও হনুমানদেবের পার্টি। গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করার পর বিজেপির প্রতি রোষ আরও

গূঢ় পুরুষের কলম

বেড়েছে। ভারতের মুসলমানেরা মনে করে গোহত্যা করা এবং গোমাংস খাওয়াটা তাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই অধিকার কেড়ে নেওয়াতে তারা রাগে ফুঁসছে। দাদরি কাণ্ডে মহম্মদ আখলাকের পরিবারের উপর হামলা হয় গোমাংস খাওয়াকে কেন্দ্র করে। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব এবং ক্ষমতাসীন সমাজবাদী পার্টি। অখিলেশ যাদব আখলাকের পরিবারকে নিরাপত্তা দেননি এই অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের মুসলমান সমাজ সাইকেলের বদলে হাতিকে পছন্দ করছেন। হাওয়া বুঝে মায়াবতী হাতি প্রতীকে ৯৭ জন মুসলমান প্রার্থীকে ভোটযুদ্ধে এবার নামিয়েছেন। সম্ভবত, উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে কোনো একটি দলের এত বেশি মুসলমান প্রার্থী অতীতে দেখা যায়নি।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় যে তিন দফার ভোট উত্তর প্রদেশে হয়েছে তার দিকে এক নজর রাখলে দেশের বর্তমান রাজনীতির চরিত্রটা বোঝা যাবে। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে দাদরি, মিরাট, কাইরানা-সহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধ্বস্ত ৭৩টি আসনে। এখানে ধর্মীয় বিভাজনের ভোটে লাভবান হওয়ার কথা বিজেপির। স্বাভাবিকভাবেই আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু ভোটদাতারা 'কমল' চিহ্নে ভোট দেবেন। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ভোট হয়েছে মুসলমান অধ্যুষিত রাহেলখণ্ড অঞ্চলে। এখানে লড়াইটা সাইকেলের সঙ্গে হাতির। রাহেলখণ্ডে বিজেপির সাফল্যের সম্ভাবনা কম। ১৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার তৃতীয় দফার ভোট হয়েছে উত্তরপ্রদেশের প্রাণকেন্দ্র কানপুর, লখনই, ইলাহাবাদ-সহ রাজ্যের ১২টি জেলার ৬৯টি আসনে। এই এলাকা সমাজবাদী পার্টির শক্ত গড় বলা যেতে পারে। গতবার এখানে ৫৫টি আসন জিতেছিল এসপি। বিজেপি ৬টি, বিএসপি ৫টি এবং কংগ্রেস মাত্র ২টিতে। সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষা অনুসারে এবার অখিলেশের এসপি দলের দুর্গরক্ষা করতে পারবে না। উল্টে এখানে বিজেপি যথেষ্ট ভাল ফল করবে বলে মনে করছেন সাংবাদিকরা। এই তৃতীয় পর্বের ভোটে যে দল ভাল করবে উত্তরপ্রদেশের কুরশি তারাই দখল করবে। তবে ভুললে চলবে না যে এবার লড়াই হচ্ছে সমানে সমানে। মোদী-অমিত শাহ বনাম অখিলেশ-রাহুল গান্ধী বনাম মায়াবতী। কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না। উত্তরপ্রদেশের লড়াইটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ভুলেই গেছি যে পঞ্জাব, গোয়া, মণিপুর এবং উত্তরাখণ্ডেও বিধানসভার ভোট হয়েছে অথবা চলছে। পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে যদি চারটি রাজ্যে বিজেপি জেতে তবু সেই জয়ের আনন্দের থেকে উত্তরপ্রদেশের জয় অনেক বেশি আনন্দের। কারণ, আসন সংখ্যার বিচারে উত্তরপ্রদেশের ভোটে সাফল্য দেশের রাজনীতির দিগ্‌দর্শনের কম্পাস। ইতিমধ্যে সেখানে তিন দফায় ৪০৩টি আসনের মধ্যে ২০৯টিতে ভোট হয়ে গেছে। বাকি আছে ১৯৪টি ভোট নেওয়া। এর মধ্যে আছে রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বুন্দেলখণ্ড। পঞ্চম দফায় দলিত অধ্যুষিত বসতি, বাহারাইচ, আম্বেদকর নগর, গান্ধী পরিবারের দুর্গ আমেঠি। এরপর আছে গোরখপুর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী। উত্তরপ্রদেশের লড়াইটা এখন নিঃসন্দেহে মোদী বনাম বাকি সকলের। জিতলে মোদীর জয়। হারলে মোদীর পরাজয়। ■

সেন মহাশয়কে কয়েকটি বিনম্র প্রশ্ন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মার্কিন প্রবাসী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, দেশভাগের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা এদেশে চলে আসার ফলে, কোনোরকম বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই, পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের কার্যটি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই তত্ত্বের পিছনে অমর্ত্যবাবু একটি যুক্তিও দিয়েছেন। অমর্ত্যবাবুর যুক্তিটি এই --- যেহেতু দেশভাগের আগে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের হাতে প্রভূত জমিজমা ছিল, তাই, দেশভাগের সময় তারা ভিটেমাটি ত্যাগ করে এদেশে চলে আসায় সেইসব জমিজমা দরিদ্র মুসলমানদের ভিতর আপনা-আপনি বিলিবণ্টন হয়ে যায়। অতএব, ভূমি সংস্কারের কাজটি সম্পন্ন করতে পাকিস্তানি সরকারকে সেসময় বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়নি। অমর্ত্যবাবুর এই তত্ত্বটি নতুন। ইতিপূর্বে আর কোনো অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ বা ইতিহাসবিদ এই ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু বিতাড়নকে 'শ্রেণী সংগ্রামের' মোড়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসও এর আগে কেউ করেননি। অমর্ত্যবাবু নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। তিনি অর্থনীতির যত নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝেন এবং বোঝান, আমরা, পাঁচ পাবলিক তা পারি না। অর্থনীতি সম্পর্কে আমরা নিতান্তই অনভিজ্ঞ। আমরা যা দেখি, যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি— তার ভিত্তিতেই যা বোঝার বুঝি। অমর্ত্যবাবু তাত্ত্বিক, আর আমরা, পাঁচ পাবলিক বাস্তবভিত্তিক। আমাদের এই সামান্য বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধিটুকু সম্বল করেই, সেন মহাশয়কে কয়েকটি বিনম্র প্রশ্ন করতে চাই।

দেশভাগ পর্বে কেন, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা ভিটেমাটি ত্যাগ করে এদেশে চলে এসেছিলেন— সে ইতিহাস বহুল চর্চিত। সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত যাচ্ছি না। শুধু কিছু তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস করছি। দেশভাগ পর্বের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা অবহিত আছেন যে, ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার দিন, নোয়াখালির পির বংশের সন্তান মুসলিম লিগের নেতা গোলাম

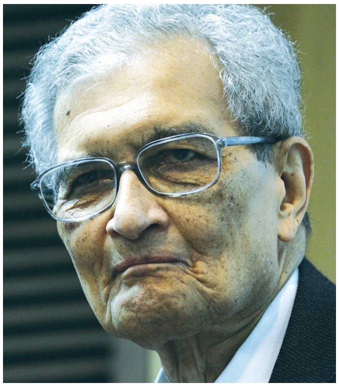

আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, পরে বাংলাদেশের মাটি থেকে হিন্দু উচ্ছেদের ঘটনাগুলিকে সেন মহাশয় সমর্থন করেন কিনা? নাকি তাঁর নতুন তত্ত্বের আড়ালে সত্য কোথাও চাপা পড়ে যাচ্ছে?

সরওয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালি জেলায় হিন্দু নিধন এবং হিন্দুদের উপর হামলা শুরু হয়। 'গান্ধী : হিজ থট অ্যান্ড লাইফ' গ্রন্থে কৃপালনি এই বীভৎসতার চিত্র তুলে ধরেছেন। কৃপালনি বলেছেন— হত্যা, লুটপাট, গণধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছে। অসংখ্য হিন্দু মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছিল। হিন্দুরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। যাঁরা জলপথে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নৌকা মাঝপথে আটক করে খুন করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২০ অক্টোবর দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা এই নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরেছিল। স্টেটসম্যান লিখেছিল --- 'রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রাইপুর, লক্ষ্মীপুর, সেনবাগ প্রভৃতি থানা এলাকায় গত দশদিন ধরে ব্যাপক হারে হিন্দু নিধন, হিন্দুদের সম্পত্তি লুট, হিন্দু মহিলা অপহরণ, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিতও করা হচ্ছে। হামলাকারীরা এখন ফরিদগঞ্জ-চরহাইন এবং চাঁদপুর জেলায় ঢুকে পড়েছে।' ১৯৪৬ সালের ৬ নভেম্বর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কলকাতা থেকে নোয়াখালির উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলেন। গান্ধীর নোয়াখালি অভিযানের সংবাদও প্রকাশ করেছিল স্টেটসম্যান। স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৪৬ সালের ১১ নভেম্বর নোয়াখালির দত্তপাড়া গ্রামে একটি জনসভা করেন গান্ধী। ওই গ্রামটি থেকে হিন্দুরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। গান্ধীর ওই সভায় উপস্থিত ছিল শুধু মুসলমানেরা। গান্ধী তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা কি চান না, হিন্দুরা আবার তাঁদের নিজের ঘরবাড়িতে ফিরে আসুন। সভায় উপস্থিত মুসলমানরা তাঁর কথায় কোনো উত্তর না দিয়েই সভাস্থল ত্যাগ করেছিল। স্টেটসম্যান লিখেছে, 'The

meeting listened to him in silence and then dispersed.' নোয়াখালির এই হিন্দু নিধন এমন বীভৎস আকার ধারণ করেছিল যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'নোয়াখালি জেলায় ও ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে ব্যাপকভাবে স্পষ্টতঃ সম্প্রদায়-বিশেষযুক্ত দলবদ্ধ সশস্ত্র গুণ্ডাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নানাবিধ দানবীয় অত্যাচারের হৃদয়বিদারক দুঃখকাহিনি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। বিংশ শতাব্দীতে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্য শাসনতন্ত্রের আমলে দীর্ঘদিন ধরিয়া এরূপ ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীহরণ এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও বিবাহ অবাধে চলিতে পারে, ইহা একেবারে কল্পনাতীত।' যে হিন্দুরা চলে আসার পর পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের কাজটি বিনা আয়াসেই হয়ে গিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন অমর্ত্যবাবু— সেই হিন্দুরা কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত নিজের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন--- তা বোঝাতে এই অবতারণাটুকুর দরকার ছিল।

এবার প্রশ্ন, নোয়াখালিতে (এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে) যে হিন্দুরা অত্যাচারিত হলেন, লাঞ্ছিত হলেন, জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ হলেন--- এঁরা কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর? এঁরা সকলেই কি প্রভূত জমিজমার মালিক হিন্দু পরিবার? ওই সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ঐতিহাসিক তথ্য-পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছে না। পূর্ববঙ্গের অন্য আর সব জেলার কথা বাদই দিলাম, শুধু যদি নোয়াখালির কথাই ধরি, তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওই সকলের পালিয়ে আসা এবং অত্যাচারিত হিন্দুদের ভিতর অধিকাংশই ছিল মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। অনেকেই ছিল নমঃশূদ্র ও তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা যে প্রভূত জমিজমার অধিকারী ছিল তাও কিন্তু নয়। অন্তত সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্য তাই বলে। এখন, এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের নিধন করে, বিতাড়িত করে কোন ভূমি সংস্কার কার্যটি সমাধান হলো— তা যদি সেন মহাশয় যুক্তিসহকারে একটু সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশভাগ পর্বটিতে পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপক হারে হিন্দু নিধন এবং হিন্দু বিতাড়ন হয়েছিল। সেন মহাশয়ের নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানেও হিন্দু বিতাড়নের মধ্য দিয়েই ভূমি সংস্কারের কাজটি সমাধা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব তা বলছে না। পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের কাজ সমাধা হয়েছে— এমন দাবি কোনো পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ কখনও করেননি, করেনও না। বরং তথ্যানুযায়ী, পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে এখনও সামন্ত প্রভুদের দাপট অটুট।

সেন মহাশয় নিশ্চয়ই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামটি অবহিত আছেন। যোগেন্দ্রনাথবাবু দলিত-মুসলিম ঐক্যের ডাক তুলে মুসলিম লিগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। ১৯৪৬ সালে ধর্মতলায় যে জনসভায় মহম্মদ আলি জিন্নাহ ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছিলেন, সেই সভামঞ্চে জিন্নাহর পাশে উপস্থিত ছিলেন যোগেন্দ্রনাথবাবুও। দেশভাগের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে জিন্নাহ্ মন্ত্রীসভায় স্থান হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথবাবুর। জিন্নাহ্র পাকিস্তানে দু' বছরের বেশি টিকতে পারেননি এই দলিত নেতা। মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়ে গোপনে পালিয়ে এসেছিলেন ভারতে। সেন মহাশয় যদি অভিনিবেশ সহকারে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ওই পদত্যাগপত্রটি পাঠ করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, পাকিস্তান নামক দেশটি জন্ম নেওয়ার পরও সেখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন অব্যাহত ছিল এবং এই অত্যাচারিত হিন্দুদের গরিষ্ঠাংশই ছিল অতি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত নমঃশূদ্র শ্রেণীর— যাদের পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার মতো সহায়সম্বলটুকুও ছিল না। কাজেই সেন মহাশয়ের ভূমি সংস্কারের তত্ত্ব নিয়ে একটু ধন্দ থেকেই যাচ্ছে।

আমরা একবারও বলছি না, সেন মহাশয় এই তত্ত্বটি খাড়া করে ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে বিকৃত করতে চেয়েছেন; আমরা বলছি না— সেন মহাশয় হিন্দু নিধনকে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে আড়াল করার অসৎ প্রচেষ্টা করেছেন; আমরা বলছি না— দেশভাগের সময় অত্যাচারিত, নির্যাতিত হিন্দু পরিবারগুলিকে অসম্মান করতে চেয়েছেন সেন মহাশয়; আমরা এও বলছি না—সেন মহাশয়ের তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিলই নেই। আমরা শুধু তাঁকে বিনম্র অনুরোধ করছি— তাঁর তত্ত্বের পক্ষে তিনি অন্তত একটি সুযুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা দিন।

তবু যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ সেন মহাশয়ের ভূমি সংস্কারের এই অভিনব তত্ত্বটি একেবারেই ঠিক— তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। একটি রাষ্ট্রে যদি ভূমি সংস্কারের কাজ কিছুটাও সুসম্পন্ন হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রে ভূমিহীন শ্রেণীর কাছে কিছু সুফল তো পৌঁছবে। অন্তত আমাদের মতো অর্থনীতি -অনভিজ্ঞদের তো সহজ বুদ্ধিতে এরকমই মনে হয়। যদি সত্যিই দেশভাগের সময় হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে ভূমি সংস্কার অনেকাংশ হয়েই থাকে, তাহলে গত ছ-সাত দশকেও তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশ থেকে পূর্ব ভারতে অনুপ্রবেশের ঢল বিন্দুমাত্র কমেনি কেন? ১৯৯২ সালের ১১ অক্টোবর সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখেছিলেন— '১৯৭১ থেকে মুসলমানরা ভারতে আসতে শুরু করে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশীকে শনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।' ২০০৪ সালে লোকসভায় তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছেন। এখন প্রশ্ন যে, সত্যিই যদি পূর্ববঙ্গে সেই ১৯৪৭ সালেই হিন্দু বিতাড়নের কারণে ভূমি সংস্কার হয়ে গিয়ে থাকে— তাহলে দশকের পর দশক ধরে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ থেকে এত অনুপ্রবেশের ঢল কেন? সেন মহাশয়ের মতোই বাংলাদেশেও একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ আছেন। তাঁর নাম মহম্মদ ইউনুস। তিনিও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রেণীর ভিতর কাজ করে থাকেন। সেন মহাশয়ের এই তত্ত্বে তাঁর সায় আছে কিনা— সেটিও একটু জানা দরকার।

সেন মহাশয়ের অবগতির জন্য আর একটু তথ্য দিই। এই তথ্যটি দেশভাগের অর্ধশতক পরের। বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে— ১৯৯৪ সালে মাদারিপুর জেলার কালকিনি থানার শশীকর, পিরের বাড়ি, ডাসার, মস্তাপুর, জহেরকান্দি, চরমুগড়িয়া গ্রামে হিন্দু পরিবার ছিল যথাক্রমে ২০০, ৩০০, ১৫০, ২৫০ এবং ৩৫০। পাঁচ বছর পর ১৯৯৯ সালে তা কমে হয়েছে ৮০, ২০, ৮, ৬৮, ১০২ এবং ২১৯। এরকমই ফরিদপুর জেলার রাজৈর থানার আমগ্রাম, সানেরপাড়, চৌরিবাড়ি, লক্ষ্মীপুরা, কদমবাড়ি, ভেন্নাবাড়ি, সিংগাসাতপাড়, ফুলবাড়ি এবং বরভিটা গ্রামে হিন্দু পরিবারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪২৬, ২০০, ৩০০, ৩৭২, ৫৮৬, ১৮৬, ৩৯৬, ২৩৬ এবং ১৫২ (১৯৯৪ সালের হিসাব)। পাঁচ বছর পরে তা কমে দাঁড়ায় ২৭৬, ৫০, ১৭৬, ১৭৯, ৪৭৬, ১৪৭, ২৮৮, ৯৪ এবং ৪৬। এই যে পরিবারগুলির পরিসংখ্যান দেওয়া হলো— এরা কেউই প্রচুর জমিজমার মালিক নয়। তবু এরা এদের গ্রামে থাকতে পারেনি। সেন মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে জানাই, ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণনা রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল, সেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ২২ শতাংশ। বাংলাদেশের সর্বশেষ জনগণনা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ওই জনসংখ্যা ৮ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। বছর দুয়েক আগে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি সম্মিলিত সংগঠন লিখিত রিপোর্ট পেশ করে অভিযোগ তুলেছিল, সেদেশে কয়েক লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু (হিন্দু-বৌদ্ধ) মানুষের কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। হয় তাদের হত্যা করা হয়েছে, অথবা ধর্মান্তর করা হয়েছে--- এমনই অভিযোগ তুলেছিল ওই সংগঠনটি। সংখ্যালঘুদের এই সংগঠনটি এর ভিতর কোনো ভূমি সংস্কারের প্রয়াস খুঁজে পায়নি। বরং তারা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিল— গত সাত দশক ধরে এশিয়া মহাদেশের এই প্রান্তে অবাধে 'এথনিক ক্লিনজিং' চলছে। সেন মহাশয়কে সবিনয়ে আরও স্মরণ করিয়ে দিই যে, বাংলাদেশ থেকে যে ছিন্নমূল পরিবারগুলি মরিচঝাঁপিতে এসে বসতি গড়েছিল, ক্ষমতায় আসার মাত্র এক বছরের মাথাতেই বামফ্রন্ট সরকার যাদের লাঠি গুলি চালিয়ে উচ্ছেদ করেছিল— তারা কিন্তু কেউই ভূস্বামী শ্রেণীর হিন্দু ছিল না। তারা ছিল নিতান্ত নিঃসহায়, নিসম্বল দরিদ্র নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত। জানতে ইচ্ছে করে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, পরে বাংলাদেশের মাটি থেকে এভাবে হিন্দু উচ্ছেদের ঘটনাগুলিকে সেন মহাশয় সমর্থন করেন কিনা? নাকি তাঁর নতুন তত্ত্বের আড়ালে সত্য কোথাও চাপা পড়ে যাচ্ছে?

সেন মহাশয় মার্কিন মুলুকে থাকেন। নোবেলজয়ী। আমরা তাঁর মতো পণ্ডিত নই। কিন্তু তাঁর এই ভূমি সংস্কারের তত্ত্বটি নিয়ে ধন্দ আমাদের থেকে যাচ্ছে। এবং থেকে যাবেও। কেননা, আমাদের মতো বহু মানুষ আছেন, যাঁদের পূর্বপুরুষদের পূর্ববঙ্গে জমিজিরেত বিশেষ ছিল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল সেসব। সব হারিয়ে একবস্ত্রে উদ্বাস্তু হয়ে তাঁদের চলে আসতে হয়েছিল এদেশে। তাদের উত্তরপুরুষ আমরা। আমাদের মনে তো স্বাভাবিকভাবে ধন্দ জাগবেই। আমরা বাধিত হব, যদি সেন মহাশয় আমাদের এই ধন্দ দূর করেন।

আমরা একবারও বলছি না, সেন মহাশয় এই তত্ত্বটি খাড়া করে ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে বিকৃত করতে চেয়েছেন; আমরা বলছি না--- সেন মহাশয় হিন্দু নিধনকে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে আড়াল করার অসৎ প্রচেষ্টা করেছেন; আমরা বলছি না--- দেশভাগের সময় অত্যাচারিত, নির্যাতিত হিন্দু পরিবারগুলিকে অসম্মান করতে চেয়েছেন সেন মহাশয়; আমরা এও বলছি না—সেন মহাশয়ের তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিলই নেই। আমরা শুধু তাঁকে বিনম্র অনুরোধ করছি— তাঁর তত্ত্বের পক্ষে তিনি অন্তত একটি সুযুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা দিন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ, ড. মোহিত রায়, দেবজ্যোতি রায়।

সাক্ষাৎকার

সেবাধর্মের আদর্শ ঠাকুরের, রূপদান স্বামীজীর : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের প্রেরণায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষণায় হাতেখড়ি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের। চৌদ্দ বছর উদ্বোধনের সম্পাদক-সহ মঠ-মিশনের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলে এখন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে সেবা ধর্মের গুরুত্ব নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বস্তিকার দুই প্রতিনিধি সন্দীপ চক্রবর্তী ও অভিমন্যু গুহ।

বর্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবর্ষে সেবাধর্মের একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আপনি কি মনে করেন যতটা প্রয়োজন সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে?

একটা কথা বলি, 'দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবর্ষ'...অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো দেশের জন্যই শুধু সেবাধর্মের প্রয়োজন, আমি সেটা মনে করি না। সেবাধর্ম...অন্তত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যা নথিপত্র পাচ্ছি...সেই বৈদিক যুগ থেকে... তখন থেকে সেবার ব্যাপারটি রয়েছে। সেবার মূল আদর্শটি উপনিষদে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে— 'শ্রদ্ধায়া দেয়ং, অশ্রদ্ধেয়া অদেয়ং'। যা কিছু দেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে, অশ্রদ্ধার সঙ্গে কখনই কিছু দেবে না। এটা হচ্ছে আমাদের উপনিষদের নির্দেশ, মানে শ্রুতির নির্দেশ আর কী! এছাড়া শ্রুতিতে বলা হচ্ছে, আরও কীভাবে দেবে। বলছেন, ভিয়া দেয়ং। অর্থাৎ সভয়ে দেবে। হ্রিয়া দেয়ং। অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয়ে দেবে। অহঙ্কার করে বা আত্মম্ভরিতা দেখিয়ে দেবে না। সংবিধা দেয়ং। অর্থাৎ মৈত্রীভাব বজায় রেখে দেবে। এ আদর্শ আমাদের সেবাধর্মের মূল আদর্শ। আমরা এটা পাচ্ছি বৈদিক সাহিত্য থেকে। এইবার কথা হচ্ছে, দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবর্ষ কবে থেকে— সপ্তদশ শতক থেকে। তার আগে ভারতবর্ষ তো দরিদ্র ছিল না। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ার পিছনে যে কারণগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বৈদেশিক আক্রমণ, বৈদেশিক লুণ্ঠন। নির্বিচারে লুণ্ঠন হয়েছে। আক্রমণ হয়েছে। আমাদের সম্পদ সব ওরা নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে প্রথম প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিক সভায়, বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলন সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমেরিকায়- লন্ডনে স্বামীজী নির্ভীক কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমরা আমার দেশকে ছিবড়ে করে দিয়েছ। এ হলো ইতিহাস। সত্যি ঘটনা। স্বামীজী এ কথাও বলেছিলেন, সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল সোনার দেশ। তখন বিদেশ থেকে আসছেন ভাস্কো দা গামা। কলম্বাস আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা এ দেশে আসতেন সোনার ভারতবর্ষকে পেতে, দেখতে। আরও যদি কিছু পাওয়া যায় সেসব নিয়ে যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ দারিদ্র্যপীড়িত সপ্তদশ শতকের পরের ভারতবর্ষ। তার আগে পর্যন্ত আমাদের যা ঐতিহ্য বা ইতিহাস সেই ভারত কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত নয়। সেই ভারতেও কিন্তু সেবা ছিল। সেবা যেমন এখন আছে বা প্রাচীন ভারতে ছিল ঠিক তেমনি করে চিরকাল থাকবে। এটা এমন নয় যে ভারত আজ দরিদ্র বলেই তার সেবার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের কাছে সেবা বা সেবার আদর্শ একটি মানসিক ব্যাপার। একটা আধ্যাত্মিক উত্তরণের ব্যাপার। শুধু একজন দরিদ্র মানুষকে সেবা করব বা দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে সেবা করব ব্যাপারটা সেরকম নয়। তাছাড়া, আজকের ভারতবর্ষ দারিদ্র্যপীড়িত— একথাটা যে খুব সত্যি তা কিন্তু বলা যাবে না। এই ভারত তো আর স্বাধীনতার আগের ভারত নয়। স্বাধীনতার পর ৭০ বছর কেটে গেছে। এই ৭০ বছরে দারিদ্র্যকে আমরা পুরোপুরি জয় করতে পেরেছি বলব না কিন্তু জয় করার দিকে অনেকটাই এগিয়েছি। এও তো ইতিহাস। সত্যি কথা স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং আজকের ভারতবর্ষ দারিদ্র্যপীড়িত— সেকথা বলা যাচ্ছে না। যদিও দারিদ্র্যকে আমরা পুরোপুরি জয় করতে পারিনি। কিন্তু দারিদ্র্যকে যদি আমরা সেবার একটা শর্ত হিসেবে ধরে নিই তাহলে কিন্তু সেবার মূল আদর্শটি ব্যাহত হবে। সেবার আদর্শ হলো, যে আর্ত বা পীড়িত তাকে তো সেবা দিতেই হবে। কিন্তু আসল কথা তো আর্ত-পীড়িত নয়। আর্ত বা পীড়িত হওয়াটা যে শুধু কতকগুলো ফিজিকাল কন্ডিশনের ওপর নির্ভর করে বা আর্থিক সমৃদ্ধি অভাবের ওপর নির্ভর করে, তা তো নয়। যে-কোনো মানুষ আর্ত হতে পারেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একথা বলেছেন। আর্ত একজন ধনীব্যক্তিও হতে পারেন। তার হয়তো অর্থের অভাব নেই, বিত্তবৈভবের চূড়োয় সে বসে আছে কিন্তু মনের দিক থেকে নিঃস্ব। তার সঙ্গে কেউ থাকে না। সেই মানুষটিও তো আর্ত। তারও তো সেবার প্রয়োজন আছে। তার হয়তো অন্যরকম সেবাধর্মের প্রয়োজন। সুতরাং দারিদ্র্যকে সেবার একটা শর্ত করে তোলা আমার মতে ঠিক নয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ বিষয়ে কিছু বলুন। এখন কী নিয়ে কাজ হচ্ছে? কাজের ক্ষেত্রগুলো জানতে চাইছি।

আমি কয়েকটা সাধারণ কথা বলি। এই যে রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশন— সব মিলিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। সঙ্ঘ বলতে মঠ ও মিশন দুইই বোঝায়। মঠ মূলত আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে থাকে। মিশন সামাজিক কাজ করে। সমাজকল্যাণ এবং জনকল্যাণই মিশনের কাজের মূল ভিত্তি। মঠ প্রধানত নজর দেয় মানুষের মানসিক প্রসারে, আধ্যাত্মিক

বিকাশে। ভজন পূজন সাধন মঠের কাজের মধ্যে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন মঠের প্রতিষ্ঠা করেন— আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা অবশ্য করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী তার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মুখ্যত দুটি উদ্দেশ্য। একটি আত্মমোক্ষ অন্যটি জগৎহিত। মঠের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন আমাদের আদর্শ হলো আত্মনোমোক্ষার্থং জগৎহিতায় চ। কথাটি বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সন্ন্যাসীদের জীবনের একরকম দিকনির্দেশ করে দিলেন। এই দিকনির্দেশনা তিনি দিলেন বটে কিন্তু দিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। আসল কাজটা অনেক আগেই ঠাকুর করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের) যে ঐতিহ্য তাতে দেখছি হাতে-কলমে প্রথম সেবাকাজ তিনিই করেছিলেন। দেওঘরের কাছে একটি সাঁওতালপল্লীতে তিনি সেবাকাজ করেছিলেন। যাচ্ছিলেন কাশী। মথুরবাবু তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে এত লোক ছিল যে দু-তিনটে কামরা রিজার্ভ করে যাচ্ছিলেন। রেল কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছিল প্রয়োজন হলে ওই কামরাগুলি খুলে দেওয়া হবে। যাই হোক, দেওঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন ঠাকুরের চোখে পড়ল একখানি সাঁওতাল গ্রাম। গ্রামের মানুষগুলোর চেহারা শীর্ণকায়। প্রায় কঙ্কালসার বলা যায়। বোধহয় অনেকদিন খাওয়া জোটেনি। ঠাকুর খুবই ব্যথিত হলেন। মথুরবাবুকে বললেন, ‘মথুর আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলব। তুমি ট্রেনটাকে দাঁড় করাও।’ ট্রেন দাঁড়াল। রিজার্ভ করা বগিগুলো খুলে নেওয়া হলো। ঠাকুর নামলেন। সঙ্গে মথুরবাবু। ঠাকুর গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বললেন। জানা গেল দু’বছর ধরে ওখানে দুর্ভিক্ষ চলছে। খাদ্যবস্ত্র কিছুই নেই ওদের। কষ্ট পেলেন ঠাকুর। বসে পড়লেন ওদের সঙ্গে গল্প করতে। এদিকে মথুরবাবু বললেন, ‘বাবা এবার তো আমাদের কাশী যেতে হবে।’ অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথকে দর্শন করবেন বলে ঠাকুর বেরিয়েছেন। তাই বারবার কাশীর কথা মনে করিয়ে দিতে লাগলেন। যাতে কাশীর কথায় অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথের কথা ঠাকুরের মনে পড়ে। ঠাকুর বললেন, ‘দ্যাখ তুই যেখানে আমায় নিয়ে যাবি সেখানে অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথ অচল। চলেও না, কথাও বলেও না। খেতে দিলে খেল কিনা তাও বুঝতে পারি না। আনন্দ পেল কী তৃপ্তি পেল তারও কোনো প্রকাশ দেখি না। এরা হচ্ছে আমার সচল বিশ্বনাথ, সচল অন্নপূর্ণা। আমি এখন এদের সঙ্গে কথা বলব। তুই তো মায়ের দেওয়ান, তো এদের এখন পেটপুরে খেতে দিতে হবে। অনেকদিন ওরা ভালো করে খায়নি। ওদের এখন খাওয়াও, বস্ত্র দাও।’ এই ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। মথুরবাবু তো বিষয়ী মানুষ। পয়সাকড়ির কথা প্রত্যেক স্তরেই ভাবতে হয়। বললেন, ‘বাবা সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। অত টাকা খরচ করব কী করে! তীর্থে যাচ্ছি এতগুলো লোক নিয়ে।’ ঠাকুর বললেন, ‘তুই যা। আমি যাব না। আমি এদের সঙ্গেই থাকব।’ মথুরবাবু প্রমাদ গুণলেন। অতঃপর মথুরবাবু কলকাতা থেকে চাল ডাল তেল নুন যা লাগে, আনালেন। ওখানে কয়েকদিন ধরে মহোৎসব হলো। সবাইকে পেটভরে খাইয়ে, নতুন কাপড় দিয়ে ঠাকুর ভারী তৃপ্তি পেলেন। তারপর যাত্রা করলেন কাশীতে। আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল রানাঘাটের কাছে কলাইঘাটে। চূর্ণী নদীর ধারে। সেখানে মথুরবাবুর জমিদারি। ঠাকুর গিয়ে দেখলেন সেখানেও মানুষ অসম্ভব দরিদ্র। তার থেকেও আশ্চর্যের ব্যাপার সেখানেও প্রায় দু’বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলছে। এদিকে মথুরবাবু গেছেন প্রজাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবে। ঠাকুর বললেন, ‘মথুর তুমি এদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেবে? এরা দেবে কোথা থেকে? এরা তো দুর্ভিক্ষ পীড়িত। অন্ন নেই বস্ত্র নেই— কী করে দেবে তোমার ট্যাক্স?’ মথুরবাবু বললেন, ‘বাবা তুমি এসব বুঝবে না। জমিদারি চালাতে গেলে ওসব করতে হয়।’ ঠাকুর বললেন, ‘রাখ তোর জমিদারি। আমি এখন এদের সঙ্গে থাকব।’ কলাইঘাটেও দেওঘরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অর্থাৎ নিরন্ন-অসহায় মানুষগুলোকে পেটভরে খাওয়ানো হলো। নতুন কাপড় দেওয়া হলো। এই দুটো ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি সেবাকাজে অংশ নিয়েছিলেন।

□ স্বামীজী প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছিলেন, যে সন্ন্যাস আমাদের শুষ্ক করে দিচ্ছে, গুরুভাইদের দুঃখে কাতর হতে দিচ্ছে না, আমি সেই সন্ন্যাস মানি না। তো, এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ...বা, পরে যখন স্বামীজী কন্যাকুমারিকায় গিয়ে বলছেন ভারতবর্ষে আগে কূর্ম অবতারের পুজো করতে হবে...এটা গুরুর আদেশ। এই যে ব্যাপারগুলো ঘটছে...এই যে সেবার আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে স্বামীজীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

□ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক কথা বলেছেন। সব কথাই যে কথামৃতে আছে তা তো নয়। ১৮৮২-র ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৮৬-র এপ্রিল পর্যন্ত ঠাকুর যা বলেছেন কথামৃতে তাই আছে। তার আগে কি ঠাকুর কথা বলেননি? সেইসব কথা কিন্তু কথামৃতে নেই। শ্রীম-র কথামৃত ছাড়াও আরও তিনটে কথামৃত আছে। কথামৃত এই অর্থে যেখানে ঠাকুরের কথা ধরা আছে। অন্যরা করেছেন। মাস্টারমশাই-য়ের আগেই তাঁরা করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের পত্রপত্রিকাতেও কিছু বেরিয়েছে। সেসব যদি মেলানো হয় এবং বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যেখানে এসেছে বা শ্রীশ্রীমায়ের কথায় যেখানে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এসেছে, সেই সঙ্গে গৃহী-সন্ন্যাসী সব শিষ্যের রচনায় যেসব রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে--- সব যদি একজায়গায় জড়ো করা হয় তাহলে আমরা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেতে পারি। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন অনেক কথা বলেছেন যা ঠিকমতো ‘স্ট্রাইক’ করেনি। মাস্টারমশাই কথামৃতকার— সারা পৃথিবীর ধারণা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথার ভাণ্ডারী। কথাটা ঠিক। এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের এমন অনেক কথা লিখেছেন যা তাকে স্ট্রাইক করেনি। ওই কথার যে কী তাৎপর্য সেটা নথিবদ্ধ করেনি। লিখতে হয় তাই লিখেছেন। তাৎপর্য জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল স্বামীজীর জন্য। উনি ঠিক কথাগুলো ধরেছেন এবং পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করেছেন। এর ফলে কী হয়েছে, মাস্টারমশাইয়ের মতো একজন অত বড়ো মানুষ, তিনি কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলে লিখছেন, চোখ বুজলে তিনি আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই? চোখ বুঝলে

মানে, তুমি যখন চোখ বন্ধ করে ধ্যান করবে তখন ভগবান আছেন আর চোখ খুলে যখন দেখতে পাবে আর্ত-বুভুক্ষু- অসহায় মানুষ, তখন তিনি নেই! এই কথাটাই স্বামীজী পরবর্তীকালে বললেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' কিন্তু কথা হলো... এই কথা মাস্টারমশাই কথামৃতে লিখেছেন। কথাটির তাৎপর্য তাকে আঘাত করেনি। আবার আর এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মাস্টারমশাই লিখেছেন, 'মাটির প্রতিমায় পুজো হয় আর জীবন্ত মানুষে হয় না?' এর মানে কী? এ তো মানুষের সেবা। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সব থেকে বেশি প্রকাশ। এসব কথা মাস্টারমশাই কিন্তু লিখেছেন। অথচ এগুলো তাঁর মাথায় নথিবদ্ধ করেনি। যার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করার সময় যখন বললেন, সন্ন্যাসীর আদর্শ হচ্ছে এইটা— নিজের মুক্তির সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জগৎকল্যাণ এবং যে সন্ন্যাসী শুধু নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয় তাকে আমি সন্ন্যাসী বলেই মনে করি না। বৃথৈব তস্য জীবনং। তার গেরুয়া বৃথা। সন্ন্যাস বৃথা। স্বামীজী যখন এইসব কথা বলছেন তখন দেখা যাচ্ছে মাস্টারমশাই নিতে পারছেন না। শুধু তিনিই নন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক শিষ্যই সেদিন স্বামীজীর কথা নিতে পারেননি। স্বামী যোগানন্দ যেমন সরাসরি বললেন, 'তোমার এসব বিদেশি ভাবের কথা। ওই যে সেবা-টেবা বলছ, এসব খ্রিস্টানদের ভাব। তুমি আমেরিকা ঘুরে এসেছে, তাই এসব কথা বলছ। ঠাকুরের জীবন কি আমরা দেখিনি?' তাঁরা দেখেছেন কিন্তু নথিবদ্ধ করেননি। ওঁরা দেওঘরের কথা, কলাইঘাটের কথা জানতেন। এই যে, 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'— কথাটি কি ওঁরা শোনেননি? শুনেছেন কিন্তু রেজিস্টার করেননি। এই রেজিস্ট্রেশন একটা বিরাট ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বলছেন, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', কথাটা তো মারাত্মক তাই না? সেই সময় ঠাকুরের ঘরে সন্ন্যাসী-সেবক মিলিয়ে অন্তত ৩০/৪০ জন বসে আছেন, কথার অর্থ কারও মাথায় ঢোকেনি। একমাত্র নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের কথা শুনে স্বামীজী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আজ যেন নতুন একটা আলো পেলাম। বনের বেদান্তকে সংসারের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার বার্তা এর মধ্যে রয়েছে। যদি কোনোদিন দিন দেন ভগবান সারা জগতে প্রচার করব।' উনি বুঝতে পেরেছিলেন। পরে নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভবত নিজেও জানতে না কী অসাধারণ জীবনযাপন তিনি করেছেন! It was a grand unconscious life! তিনি জানেন না এর অর্থ কী, তাৎপর্য কী! He was contended with that। জীবনযাপন করেই তিনি সন্তুষ্ট। It was left for me fot discover from begining to end। বিবেকানন্দকে না পেলে আমরা বুঝতেই পারতাম না শ্রীরামকৃষ্ণ কী দিয়ে গেলেন। সেবাধর্মের ব্যাপারটা— ওই যে, 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' একেই স্বামীজী বলতেন প্র্যাকটিকাল বেদান্ত। হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, ভারতের নবজাগরণের মূল পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীর কুলকুণ্ডলিনী জাগানোর মাধ্যমে তিনি সারা ভারতের কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেবার কথা বললে বলা চলে স্বামীজী এটা পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শশী মহারাজ অর্থাৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেছিলেন, 'গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না।' কথাটা মারাত্মক। চার হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো ধর্মাচার্য একথা বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলার পরে অনেকে বলেছেন কিন্তু তার আগে কেউ না। আগে পেট ভরাও তারপর ধর্ম-ধর্ম করো। স্বামীজী বলছেন, ক্ষুধার্তকে ধর্মের কথা শোনানো মানে তাকে অপমান করা।'

■ **রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সূচনা হয়েছিল স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে। পরবর্তীকালে স্বামীজীর প্রেরণায় স্বামী অখণ্ডানন্দজীও সেবাকাজে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়টি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।**

■ অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সেবাকাজের প্রথম রূপকার। প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণের, ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দের কিন্তু প্রথম রূপকার স্বামী অখণ্ডানন্দজী। তিনি বগুলা, ভাবতা পরে সারগাছিতে সেবাকাজের রূপায়ণ করলেন। তার আগে যখন উনি রাজপুতানাতে পরিক্রমা করছেন তখন করেছিলেন। ওই যে ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রজাদের মধ্যে। কিংবা অন্য অনেক রাজ্যেও। স্বামীজী ওকে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন। অনেকে ভয় পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা বোধ হয় রাজার বিরুদ্ধে চলে যাবে। রাজা হয়তো এসব পছন্দ করবে না। অখণ্ডানন্দ ওসব ভাবছেন না, রাজা খুশি হলো না অখুশি হলো। রাজাকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করছেন, 'এটা কি আপনার কর্তব্য?' সন্ন্যাসী হয়ে রাজার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলে যে তাঁর ক্ষতি হতে পারে সে ব্যাপারে অখণ্ডানন্দজী নির্বিকার। নির্ভীকতা সন্ন্যাসীর সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য। স্বামীজী বলতেন, 'সমস্ত উপনিষদ মন্থন করে আমি একটিমাত্র শব্দ পেয়েছি, অভি। এর অর্থ নির্ভীক হও। fearless।' অথচ আমাদের এত বেদান্তপণ্ডিত তারা কই একথা কোনোদিন বলেনি! সন্ন্যাসের আদর্শ যে নির্ভীকতা, তা কেউ বলেনি। স্বামীজী নির্ভীকতার উদাহরণ দিতে আলেকজান্ডারের একটি গল্প বলতেন। আলেকজান্ডার চলে যাচ্ছেন দেশে। খুব ইচ্ছে এ দেশের কোনো বড়ো দার্শনিককে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। খোঁজ করছেন কে আছেন, কে যেতে চান। ছিলেন তো অনেকেই। একজনকে নিয়ে আসা হলো। আলেকজান্ডার বললেন, 'আমি আপনাকে অনেক বিত্তবৈভব, সম্মান দেব। আপনাকে শুধু আমার সঙ্গে আমার দেশে যেতে হবে।' কিন্তু সেই দার্শনিক কোনো উত্তর দিলেন না। পাত্তাই দিলেন না বলা যায়। তখন আলেকজান্ডার ক্ষিপ্ত হয়ে তলোয়ার বের করে বললেন, 'আপনি যদি আমার কথার উত্তর না দেন তাহলে আপনাকে এখানেই হত্যা করব।' সেই দার্শনিক হা হা করে হেসে বললেন, 'শোনো আলেকজান্ডার, তুমি দেশ-বিদেশ জয় করতে পারো, দিগ্বিজয়ী হতে পারো কিন্তু মনে রেখো তুমি একজন মিথ্যেবাদী।' একদম মুখের ওপর বলে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আমাকে মারবে? তুমি আমার দেহটাকে মারতে পারো...' এই বেদান্ত আসছে। গীতা উপনিষদ সব আসছে। বললেন, 'আমার আত্মাকে তো তুমি স্পর্শ করতে পারবে না। ও অজর অমর। তার জন্মও নেই, মৃত্যু নেই।'

এই কথাটা জ্ঞানযোগের লেকচারে স্বামীজী বলেছেন, লন্ডনে-আমেরিকায় সর্বত্র বলেছেন। এই হচ্ছে নির্ভীকতা। উপনিষদ যে আমাদের এত বড়ো বাণী দিয়েছেন— নির্ভীক হও, অভী হও। কই কোনো ঋষিমুনি তো এই কথা বের করেননি। অত বড়ো ব্যাখ্যাতা আচার্য শঙ্কর, তিনিও তো বের করেননি। এইজন্য বিবেকানন্দের দরকার ছিল। স্বামীজী ফিরেছেন আমেরিকা থেকে। কথা বলছেন। ঘাবড়ে যাচ্ছে পুরনোপন্থী লোকেরা। তাঁদের বিস্ময়, 'এমন কথা তো শঙ্করাচার্যও বলেননি!' স্বামীজী বললেন, 'হ্যাঁ, শঙ্করাচার্য বলেননি। আমি বিবেকানন্দ বলছি।' এটা মারাত্মক কথা না? আর একজন শঙ্করাচার্যের দরকার কিন্তু এখন বিবেকানন্দ এসেছেন। পরবর্তীকালে অনেক বড়ো বড়ো আচার্য আসবেন। কিন্তু ওই ধাক্কাটা দেওয়া তো দরকার ছিল। আর ক'বছরের জীবন তাঁর? মাত্র ন' বছরের কর্মজীবনে তিনি ঝঞ্ঝার মতো এদিক থেকে ওদিকে ঘুরেছেন। সবসময় ঠাণ্ডামাথায় কাজ করতে পারেননি। যাই হোক, অখণ্ডানন্দজী সেবাকাজের প্রথম রূপকার। অসাধারণ রূপকার তিনি। তিনি ওই অনাথ বালকদের— হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদ করছেন না। উনি তাদের খাওয়াতেন, চান করাতেন, বিছানা করে দিতেন, ঘুম পাড়াতেন। যখন চান করাতেন--- যা আমাদের রেকর্ডে আছে— জল ঢালার সময় নারায়ণসূক্ত, পুরুষসূক্ত পাঠ করতেন। এটাই তো নারায়ণ সেবা। দরিদ্র নারায়ণ, আর্তনারায়ণ, মূর্খনারায়ণ সকলের সেবা। এটাই তো বিবেকানন্দ বলেছিলেন। সেবার স্পিরিটটা ঠিক কোথায়— উপনিষদ থেকে আমরা যা পেয়েছি, স্বামীজী যার ব্যাখ্যা করেছেন, স্বামী অখণ্ডানন্দজী সেটাই হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেখালেন।

□ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর শিষ্য হিসেবে মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (আর এস এসের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী) তাঁর থেকেই বোধহয় সেবাকাজের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

□ সে তো বটেই। এছাড়া স্বামীজীর আরও দু'জন শিষ্য ছিলেন। কনখলে করলেন স্বামী কল্যাণানন্দ আর স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। এরা কনখলে সেবার কাজ শুরু করলেন। ওরা ছিলেন ভাঙ্গি সাধু। লোকে ডাকত না। বলত, 'ভাঙ্গি মানে মেথর। লোকের মলমূত্র পরিষ্কার করে।' এখন কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে ডাকতেই হবে। নয়তো ভাণ্ডারাই হবে না। ওরা দুটো জায়গা বাছলেন। একটা কনখল। ওখানে একটা হাসপাতাল হলো। আর একটা জায়গা কাশী। খোদ বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার জায়গা। ওখানেও হাসপাতাল মানে সেবাশ্রম হলো। স্বামীজীর আদর্শে। স্বামীজী দেখে গিয়েছিলেন। ওখানে করলেন শুভানন্দজী, অচ্যুতানন্দজী। এরা সবাই স্বামীজীর শিষ্য। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' বইটি পড়লে এদের কথা জানা যাবে। এরাও কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-ভাবনার রূপকার।

□ শেষ প্রশ্ন। আধুনিক ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের তাৎপর্য আর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

□ আসলে এই প্রাসঙ্গিক কথাটা কিন্তু রিলেটিভ, আপেক্ষিক। গতকাল যা প্রাসঙ্গিক ছিল না আজ তা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। আবার আগামীকাল তার প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই, প্রাসঙ্গিক শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না। কারণ এর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের তাৎপর্য কী আমি বরং সেটা বলি। রামকৃষ্ণ মিশনের যে তাৎপর্য আমার মনে হয় এর একটা চিরন্তন তাৎপর্য আছে। রামকৃষ্ণ মিশন হয়তো সাময়িকভাবে কিছু ত্রাণ দিচ্ছে, যেটা এক্ষুনি দরকার। ভারত সেবাশ্রমও যেমন করছে— এক্ষুনি যেটা দরকার তার ব্যবস্থা করা। আবার immediate relief দেবার সঙ্গে সঙ্গে sustainable relief-ও দিচ্ছে। ভারত সেবাশ্রমও দিচ্ছে। বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি, স্কুল করছি, হাসপাতাল করছি— কেন করছি এগুলো? যাতে আবার যদি বন্যা হয় বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় তাহলে এগুলো কাজে লেগে যাবে। এর পাশাপাশি আমরা যেটা ভাবি, সারাজীবন ধরে বা যুগ যুগ ধরে শুধু রিলিফের কাজ করলে দেশের সেবা বা মানুষের সেবা করা হবে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞানকে আনতে হবে। চেতনার জাগরণ ঘটাতে হবে। আজকে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কাজ করছে, আশা করি বহু শতবর্ষ ধরে ওরা কাজ করে চলবেন। কিন্তু সেটা তো সবসময় রিলিফ করে? কই আমেরিকায় তো এরকম রিলিফের দরকার হচ্ছে না। জাপানে দরকার হচ্ছে না। কারণ ওরা এমন একটা সামাজিক কাঠামো তৈরি করেছে যার জন্য ভাবতে হয় না। আমাদের সেদিকেও নজর দিতে হবে। সেজন্য আমাদের মূল কথা হচ্ছে awareness। শিক্ষা সচেতনতা আনতে হবে। মানুষ যাতে মানুষকে ভালোবাসে। আমরা যে একে অপরের ভাই এবং বোন— যেটা স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় বলেছিলেন, এই চেতনা যদি আমরা মানুষের মধ্যে আনতে পারি, তা যেমন ভ্রাতৃত্ব বা সহমর্মিতা নিয়ে আসবে ঠিক তেমনি পারস্পরিক মৈত্রী প্রেম ও ভালোবাসারও উদ্রেক করবে। বুদ্ধদেব একথা বহু শতবর্ষ আগে বলেছিলেন। Immediate relief দরকার। কিন্তু শুধু সেইটুকু দিয়ে আমরা দেশকে পঙ্গু করে দেব না। এ তো পঙ্গু করে দেওয়া। মানুষকে ভিখিরি করে দেওয়া। এর পাশাপাশি মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে। তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে হবে। এখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের তাৎপর্য। আমরা মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অবশ্যই মেটাব। কিন্তু এখানেই আমরা থামব না। মানুষের মধ্যে সেই চেতনার জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করব যাতে মানুষ সবসময় মানুষকে ভালোবাসে। ভ্রাতৃত্বের নীতি, সহমর্মিতার নীতি— এই যে ঔদার্য, এটা যেন মানুষের মধ্যে থাকে। এটা আমরা চেষ্টা করি। এই চিন্তার প্রসারটা দরকার। এই যে awareness— আত্মিক ক্ষেত্রে, মানসিক ক্ষেত্রে এটার খুব প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মেটাচ্ছে, পাশাপাশি এই কথাগুলোকেও মনে রেখে। এগুলোই আমাদের আসল কথা। মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। মানুষকে মানুষের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে দাও। মানুষ যেন সত্যিকারের মানুষ হয়। তাহলে এসবের কোনো প্রয়োজনই হবে না। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তাহলে কি এসব হয়? টাকা দিচ্ছে সরকার। সব লুটপাঠ করে শেষ করে দিচ্ছে। তার কারণ মানুষ নয় তো! সরকারের টাকা মানে জনগণের টাকা। মান আর হুঁশের অভাব। এই হলো আমার ধারণা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

তিনি ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি মানুষের দুই হাজার বছরের অধ্যাত্ম-সাধনার ঘনীভূত রূপ— 'consummation of two thousand years of spiritual life of three hundred million people'— (দ্য লাইফ অফ রামকৃষ্ণ, পৃ. ৯৩)। শুধু তাই নয়,— তিনি গোবিন্দ রায়ের কাছে 'আল্লা'-মন্ত্র নিয়ে তিনদিন ইসলাম-ভাবে ছিলেন। তিনি আবার যদু মল্লিকের বাড়িতে যিশুখ্রিস্টের

গুণীজনেরা বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরপুরুষ। তিনি কী ছিলেন সেটা জানি না। তবে জার্মান মনীষী ম্যাক্সমুলার লিখেছেন, 'He was a wonderful mixture of god and man'— (রামকৃষ্ণ, পৃ. ৫৮)। একান্ন বছরের জীবনে তিনি প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বর চিন্তা করেছেন, হয়তো তার ফলে তিনি ঈশ্বরময়ও হয়ে উঠেছিলেন। মথুরবাবু তাঁর মধ্যে স্বয়ং মা-কালীকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথ পেয়েছেন ঈশ্বরের ছায়া। সারদা-মা ঠাকুরের মহা-মৃত্যুলগ্নে 'আমার কালী-মা' বলে কেঁদে উঠেছিলেন। গিরীশচন্দ্র তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করেছেন।

কিন্তু তিনি নিজেকে কখনও জাহির করেননি— আজন্ম তিনি ছিলেন ভক্ত। তিনি যখন কৈশোরে 'মা-মা' বলে গঙ্গামাটিতে লুটিয়ে কাঁদতেন, অনেকে মনে করত— তাঁর মা গত হয়েছেন বা তাঁর শূলব্যথা উঠেছে। অহর্নিশ কেটে যেত ধ্যান, জপে, প্রতি মুহূর্তে লেগে থাকত প্রার্থনা আর ধ্যান। প্রথম দিকে পূজারীতিও প্রাধান্য পেত না— তিনি নিজের মতো করেই তাঁর ঈশ্বরসাধনা শেষ করেছেন। স্বামী নিখিলানন্দ তাই মন্তব্য করেছেন, 'As his love for god deepened, he bagan to forget or to drop formalities of worship'— (শ্রী রামকৃষ্ণ, পৃ. ১৯)। ফল এলে ফুল পড়ে যায়। তখন তাঁর সাধনায় সিদ্ধি এসেছে— তিনি ঈশ্বরীয় ভাবমূর্তি গ্রহণ করেছেন।

আসলে, তিনি বিচিত্র ধরনের সাধনা করেছেন। ভৈরবী-ব্রাহ্মণী তাঁকে তন্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন, তোতাপুরী দিয়েছেন অদ্বৈত-সাধনায় দীক্ষা। তিনি মধুরভাবে, বাৎসল্য ধারায় দাস্য-আবেগে ও শাক্তরসে আপ্লুত হয়েও সাধনা করেছেন। তিনি একাধারে ছিলেন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, বাউল, তান্ত্রিক এবং অন্যান্য সব কিছু। কুমারকৃষ্ণ নন্দীর 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ' বইটা পড়লেই বোঝা যায় যে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র আত্মস্থ করে তিনি তাঁর মর্মকথা ছোট্ট ছোট্ট উপমা, গল্প ও গানের মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন,

ফটো দেখে খ্রিস্ট-ভাবেও কয়েকদিন বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' হিসেবে দেখেছেন। শিখ কুঁয়োর সিং তাঁকে নানক-ভাবে পুজো করেছেন, খ্রিস্টান প্রভুদয়াল তাঁর মধ্যে দেখেছেন প্রভু যিশুকে।

অথচ তিনি কখনও স্বরূপ দেখাননি। কখনও তিনি বলেছেন, 'আমি মূর্খোত্তম।' কখনও বলেছেন, 'আমি খাই-দাই থাকি।' কেশবচন্দ্র তখন বলেছেন, 'আপনি কতদিন এভাবে থাকবেন— দেখবেন এক সময় দক্ষিণেশ্বর লোকে-লোকারণ্য হবে'— তিনি সবিনয়ে হাত জোড় করে বলেছেন— 'তাঁদের যদি দয়া হয়, তাঁরা আসবেন।'

সত্যিই এক সময় দক্ষিণেশ্বর লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। হাজার হাজার দুঃখী তাপী মানুষ তাঁর কাছে ছুটে গেছেন একটু সান্ত্বনা, শিক্ষা ও দীক্ষা লাভের জন্য। আধার বুঝে তিনি পার্ষদদের দিয়েছেন সন্ন্যাস, আবার অন্যদের দিয়েছেন আদর্শ গৃহী হওয়ার মন্ত্র। এমনকী, মহাকবি মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, শ্রীম, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নমস্য মানুষরাও মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনেছেন। যখন 'রাজধর্ম' খ্রিস্টধর্ম আলোড়িত করেছে অনেককে, তখন তাঁর আদর্শ ও বাণী আমাদের সনাতন ধর্মকে আগলে রেখেছে তার বিপুল মহিমায়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো— তিনি যে ধর্মের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে জড়িত ছিল সেবাধর্ম। আমাদের শাস্ত্রবাক্যে আছে— 'আত্মনং মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়।' সেই বাণী অনুসরণ করেই তিনি শিখিয়েছেন— 'জীবসেবা হলো শিবসেবা।' তিনি সবাইকে গুহাকন্দরে বা পাহাড়ে আত্মমুক্তির জন্য সাধনা করতে বলেননি— ঈশ্বরসন্ধানকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন জীবসেবার সঙ্গে।

তাই তিনি বলতে পেরেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' তিনি মাঝে মাঝে বলতেন— 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা/কালিদাস হলো বুদ্ধিহারা।' তিনি বুঝেছিলেন যে,

অন্নচিন্তা থাকলে অন্য চিন্তা করা যায় না। তাই তিনি মরমি হৃদয় নিয়ে আগে মানুষ ও জীবজন্তুর সেবা করার জন্য সবাইকে ডাক দিয়েছেন।

এটা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর একটি দরদি মন ছিল। দেওঘরে মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থদর্শনের সময় একটা দরিদ্র পল্লীর মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। তিনি মথুরবাবুকে বলে তাঁদের একদিনের খাওয়া ও একটা করে বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন--- (স্বামী সারদানন্দ--- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, অখণ্ড, পৃ. ২৭৯)। মথুরবাবু অবশ্য খরচের কথা ভেবে একটু ইতস্তত করেছেন—কিন্তু ঠাকুর অনড় হয়ে ওঠায় তাঁকে ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

আরেকবার মথুরবাবুর সঙ্গে সাতক্ষীরার কাছে তাঁর জমিদারিতে ঠাকুর বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেও পল্লীবাসীদের দুর্দশা দেখে তিনি কাতর হয়ে ওঠেন। তাঁর চাপে মথুরবাবু তাঁদের একমাথা তেল, একটা করে কাপড় ও একদিনের ভোজনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন— (স্বামী তেজসানন্দ— শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী, পৃ. ১১২)।

আসল কথা হলো— তিনি আজীবন ঈশ্বর-সাধক হলেও সেই সাধনার সঙ্গে সেবাকর্মকে যুক্ত করেছেন পরম যত্নে। শুধু মানুষই নয়— সব প্রাণীর জন্যই ছিল তাঁর অগাধ মমতা। একবার কাশীমন্দিরের সামনে একটা বেড়ালকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল— মহামায়া বুঝি এই রূপ ধরে কিছু বলতে চান। অন্য এক দিন ভক্তরা ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছেন— গাড়িতে অনেকে ওঠায় তিনি বলেছেন, ঘোড়াটার কিন্তু কষ্ট হবে। আর একদিন দুই জা উপোস করে যাওয়ায় তাঁদের ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুখ দেখে তিনি আগে তাঁদের প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে দারিদ্র্য-মোচনের বর চাওয়ায় তিনি 'তথাস্তু' বলেছিলেন— সেই দরিদ্র মানুষটিই পরে হয়েছেন 'বসুমতী'র কর্ণধার।

তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র, হৃদয়বান সাধক— তাই তাঁর কাছে ঈশ্বর ও প্রাণী এক হয়ে গিয়েছিল। একবার অর্ধ-বাহ্য দশায় তিনি বলেছেন--- 'জীবে দয়া---জীবে দয়া? কীটাণুকীট, তুই জীবকে দয়া করবি কি? দয়া করার তুই কে? না, না— দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা'— (স্বামী তেজসানন্দ, ঐ, পৃ. ১৫৬)। নরেন্দ্রনাথ সেই কথা শুনেই তাঁর পথের দিশা পেয়েছেন, বুঝেছেন--- জীবসেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর সাধনা করতে হবে।

অন্য একদিন তিনি ঠাকুরের কাছে নির্বিকল্প সমাধি চেয়ে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। ঠাকুর কঠোরকণ্ঠে বলেছিলেন তিনি ভেবেছেন, তাঁর নরেন বটগাছ হয়ে ছায়া দেবে অনেককে— তিনি কিনা স্বার্থপরের মতো চাইছেন আত্মমুক্তি!

সেদিনও নরেন্দ্রনাথ পেয়েছেন চলার পথের নিশানা। সমাধি নয়— আত্মমুক্তি নয়— চাই জীবসেবা। সেটাই হবে সাধনার অন্যতম দিক। আসলে, ঠাকুরের সেই জীবসেবার উপদেশটা অনেকেই শুনেছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মতো তার তাৎপর্য কেউ বোঝেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, বেদান্ত-শিক্ষাকে কঠোর ও শুষ্ক মনে হলেও ঠাকুর সেটাকে সহজ-সরল করে বাস্তবে পরিণত করতে চান—(কৃষ্ণা সেন— লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃ. ২৯)। পরবর্তীকালে যখন তাঁর উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন' তৈরি হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হিতার্থে কাজ করা, পারিবারিক-মানসিক-পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধন করা ইত্যাদি'— (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭)। ক্রমে সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, অনাথ-আশ্রম স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয়, হরিজন- সেবা, ছাত্রাবাস তৈরি, কর্মশিক্ষালয় সৃষ্টি, বন্যাত্রাণ, ডিস্পেনসারি স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয়, বস্তি-উন্নয়ন, বস্ত্র-বিতরণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদি হয়ে উঠেছে মিশনের কর্মসূচির অঙ্গ--- (স্বামী সোমেশ্বরানন্দ--- লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃ. ১২৭-২৮)।

একবার প্লেগ রোগ ঠেকানোর জন্য টাকার চিন্তায় স্বামীজী বেলুড় মঠও বিক্রি করতে চেয়েছিলেন— শ্রীমা তাঁকে নিরস্ত করেছেন।

ঠাকুর শুধু মানুষের জীবনযাপন নিয়ে তৃপ্ত হতে পারেননি— তিনি চেয়েছেন তাদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। এক সময় সন্ধ্যে হলেই কুঠিবাড়িতে উঠে তিনি কেঁদে কেঁদে ডাকতেন— ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়। মনে হোত পাগল হয়ে যাব।'

ক্রমে দলে দলে মানুষ এসেছেন। তিনি শিখিয়েছেন ঈশ্বরলাভ ও মানব-সেবার মন্ত্র। তিনি বুঝিয়েছেন— 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।' তিনি বুঝিয়েছেন— ঈশ্বরলাভই জীবনের লক্ষ্য।

কিন্তু তার সঙ্গে চাই প্রীতি, মমতা ও সেবার মানসিকতা। সব প্রাণীর মধ্যেই তিনি তাই তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। মহাপ্রয়াণের আগে--- কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ) ছিপে মাছ ধরে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কারণ, ঠাকুরের মতে, টোপের মাধ্যমে লোভ দেখিয়ে মাছকে ধরা তার সঙ্গে নির্লজ্জ প্রতারণা— (স্বামী অভেদানন্দ— আমার জীবনকথা, পৃ. ৭৫)।

এই করুণাময় ঠাকুরই কোটি কোটি মানুষকে দেবত্বের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি একবার শ্রীমাকে বলেছেন— 'কলকাতার লোকগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে— তুমি তাদের জন্য কিছু করবে না?'

বোঝা যায়— তিনি শুধু ঈশ্বরের সন্ধান করেননি, তিনি সেই সঙ্গে চেয়েছেন মানুষের কল্যাণ। একবার এক ভক্ত বলছিলেন— 'টাকার দরকার— পাঁচটা দানধ্যান'—

ভক্তকে থামিয়ে দিয়ে তিনি রাগত কণ্ঠে বলেছেন, রেখে দাও তোমার দানধ্যান। পাশের বাড়ির লোক খেতে পাচ্ছে না— সেইদিকে খোঁজ নেই, দানধ্যানের কথা!

কে বলে তিনি শুধু ঈশ্বরসন্ধানী পুরুষ? তাঁর শিক্ষা থেকেই তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন— যতদিন দেশে একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমি মোক্ষ চাই না, তাদের সেবা করতে চাই। এই শিক্ষার মর্ম আমরা কিন্তু বুঝিনি। তাই তাঁর বা তাঁর পার্ষদদের মূল্যায়ন আজও হয়নি। ■

চিঠিপত্র

মমতার জিহাদি বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের দিদি থুড়ি পশ্চিম-বাংলাদেশের রূপকার থুড়ি বঙ্গেশ্বরী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তাঁর ইসলামি বাজেট বরাদ্দ অবশেষে বিধৃত করেছেন। আর তার হিজাবের তলা থেকে মা-মাটি-মানুষ নামক বিড়ালটি শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষ নামক ধাপ্পাবাজিটা আসলে চিটফান্ডের 'মানি', সিন্ডিকেটের 'মাসলম্যান' আর জিহাদি 'মুসলমানের' আস্তানা। তাই মমতা ব্যানার্জী মা-মাটি-মানুষের নামে উৎসর্গীকৃত বাজেটকে মানি-মাসলম্যান-মুসলমানের বাজেটে রূপান্তরিত করেছে।

জিহাদি লক্ষ্যে অবিচল থেকে গত বাজেটের বরাদ্দের প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করে মমতা সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করছেন রেকর্ড পরিমাণ ২৮১৫ কোটি টাকা। আর এই বরাদ্দ রাজ্যের ভারী-মাঝারি শিল্প-বস্ত্র-পর্যটন ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বরাদ্দ ২১৫৪ কোটি টাকার থেকেও বেশি। শুধু তাই নয়, দিদি সবুজ মনে মোল্লার ধন বাড়াতে বরাদ্দ করেছেন ২৮১৫ কোটি টাকা, যা রাজ্যের সেচ-জলপথ বিভাগের বরাদ্দ ২৪১০ কোটি টাকা বা অন্যান্য অনগ্রসর-উপজাতি-উত্তরবঙ্গ -সুন্দরবঙ্গ আর পশ্চিম অঞ্চল উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ২৭৭৫ কোটি টাকার থেকেও বেশি। একথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, এই বাজেটে মমতা তার মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার রেকর্ড ভাঙতে গিয়ে গণতন্ত্রকে বেশ ভালো করে ধর্ষণ করেছেন।

এই রাজ্যে অনগ্রসর-তফশিলি জাতি-উপজাতি ভুক্ত হিন্দুর সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি। আর সংখ্যালঘু (?) মুসলমানের সংখ্যা ৪০ শতাংশের নীচে। তাহলে গণতন্ত্র ও সংখ্যাতত্ত্বকে গুলি মেরে ৫০ শতাংশের বেশি অনগ্রসর-তফশিলি জাতি-উপজাতি ভুক্ত হিন্দুর জন্য ২৭৭৫ কোটি টাকা আর ৪০ শতাংশের নীচের জনসংখ্যার মুসলমান আর মাদ্রাসার জন্য ২৮১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় কোন যুক্তিতে?

মনে রাখতে হবে, অন্যান্য অনগ্রসর উপজাতি উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন আর পশ্চিম অঞ্চল উন্নয়ন খাতে প্রদত্ত ২৭৭৫ কোটি টাকা থেকেও মোল্লা ওবিসি নেপোরা দই মেরে যাবে। কিন্তু মোল্লা আর মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ ২৮১৫ কোটি টাকা থেকে হিন্দুরা কিছুই ছুঁতে পারবে না। বাংলায় টি এম সি-কারী এসসি/এসটি/ওবিসি নেতা-মন্ত্রী, সদস্য-সমর্থক বা পশ্চিমবঙ্গের এসসি/এসটি/ওবিসি সংগঠনকারী হিন্দুরা কি কিছুই বোঝে না?

আর রাখ-ঢাক না রেখে মুখ্যমন্ত্রী যে তীব্র ও নির্লজ্জ সংখ্যালঘু উন্নয়নের (পড়ুন মুসলমান তোষণ) পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তাতে সমগ্র পশ্চিমবাংলা অচিরেই খাগড়াগড়-ধুলাগড়-সমুদ্রগড়, দেগঙ্গা-উস্থি-ক্যানিং, ঢোলা-তেহট্ট- কালিয়াচকে পরিণত হবে। এখন জাতপাত-রাজনীতি-ভেদাভেদের সমস্ত গণ্ডি মাড়িয়ে বাংলার হিন্দু যদি একযোগ বাঁচার লড়াইয়ের সংকল্প না করে তাহলে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের কথাই সত্যি হবে। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হবে।

তাই, আসুন এবার ঘুরে দাঁড়াই। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ, অরবিন্দ, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাতঙ্গিনী- রাণী রাসমণি, শ্যামাপ্রসাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাকে বরকতি-আরাবুল- মনিরুলদের বাংলা হওয়া থেকে বাঁচাই। আসুন, সন্ত্রাস-জেহাদ-তোষণ-বৈষম্য-দুর্নীতিকে কবর দিই। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের বাঙালি হিন্দুর সুরক্ষা ভূমি পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করি।

—**উপানন্দ ব্রহ্মচারী,**
তারাপীঠ, বীরভূম।

অগ্নিপুত্র

সাম্প্রতিক স্বস্তিকার একটি সংখ্যায় অমিত ঘোষ দস্তিদারের 'চারণ কবি বসন্ত গোবিন্দ পোৎদার' লেখাটি পড়ে স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন হলাম। ষাট বা সত্তরের দশকে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বিদ্যার্থী পরিষদের একটি সভায় ওঁর অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। কিন্তু

উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ পাওয়ায়, সেখানে চলে যেতে হয়।

'অগ্নিপুত্র' নামে বাংলায় বসন্ত পোৎদার যে অনুষ্ঠান করতেন সেটি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা। এ প্রসঙ্গে সুনীলের কথা এখানে তুলে ধরি। "...বাংলাতেও ওই রকম একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়ে সে আমাকে অনুরোধ করে বাংলা ভাষ্যটি লিখে দেওয়ার জন্য। আমি মঞ্চ সম্পৃক্ত কোনো কাজে কখনো হাত দিইনি, ওই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই বলেই রাজি হতে পারি না। কিন্তু এই যুবকটি অতিশয় নাছোড়বান্দা। তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাসের সন্ধানে আমাকে ব্যাপৃত হয়ে পড়তে হয়। তারপর এই রোমাঞ্চকর ইতিহাস আমার দিন রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। এই রচনার বহু উপকরণ বসন্ত গোবিন্দ পোৎদার আমার জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছে। গ্রন্থের নামকরণের ব্যাপারেও আমি তার কাছে ঋণী।"... ঠিক ওই সময়েই আনন্দ পাবলিশার্স 'অগ্নিপুত্র' নাম দিয়ে ভাষ্যটি পুস্তকাকারে বের করে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে আর তারা সংস্করণ বের করে না। সম্প্রতি ২০১২ সালে দে'জ পাবলিসিং বইটি আবার ছেপে বের করেছে। এজন্য দে'জ ধন্যবাদার্হ। বইটি অবশ্য পাঠ্য।

—**বিকাশ ভট্টাচার্য,**
৬৫/৭, জ্যোতিষ রায় রোড কল-৫৩।

ফরিয়াদ

আমি তসলিমা নাসরিন—
বাংলাদেশের মেয়ে, একজন বাঙালি।
হে কংগ্রেস ভারত, কমিউনিস্ট ভারত,
সমাজবাদী ভারতের সেকুলার বন্ধুরা,
তোমরা বলতে পার
কি দোষ আমি করেছি?
আমি একজন লেখাপড়া-জানা
সাধারণ শিক্ষিতা মেয়ে।
কিছু বই লিখেছি—
মানুষের কথা আছে তাতে,
কিছু মানুষের অমানুষ হয়ে যাওয়ার কথা আছে।
তাই যারা অমানুষ, তারা
আমায় তাড়া করলে।
আমি তসলিমা নাসরিন, মানবতাবাদী।
প্রথমেই ভাবলাম—আমি তো বাঙালি তাই
কমিউনিস্ট পশ্চিমবাংলায় যাই।
ওখানে সব প্রগতিশীল শিক্ষিত লোকের বাস,
ওরা আমাকে বুঝবে, আমাকে বাঁচাবে।
আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হলো,
দেখলাম কমিউনিস্ট বাংলা
আর ইসলামিক বাংলায় কোনো তফাত নাই।
কমিউনিস্ট বাংলা আমাকে বিতাড়িত করল,
কারণ মৌলবাদী অমানুষদের কথা লিখেছি তাই।
আমি তসলিমা নাসরিন,
আমি কি দোষ করেছি
হে কংগ্রেস ভারত, কমিউনিস্ট ভারত,
সমাজবাদী ভারতের সেকুলার বন্ধুরা
বলতে পার? কেন এত ঘৃণা পেলাম তোমাদের কাছে?
অমানুষের কাছে তাড়া খেয়ে
বাঁচার আশায় মানুষের কাছে গিয়েছিলাম,
একটু আশ্রয় চেয়েছিলাম
সেকুলার, প্রগতিশীল, কমিউনিস্ট পশ্চিমবাংলার কাছে।
একটু আশ্রয় দিলে না আমায়?
আমি তসলিমা নাসরিন, লেখাপড়া-জানা
মানবতাবাদী সাধারণ মেয়ে,
বুঝলাম—হে কংগ্রেস ভারত, কমিউনিস্ট ভারত
সমাজবাদী ভারতের সেকুলার বন্ধুরা
মুখোশের আড়ালে আরও ভয়ঙ্কর তোমরা।

—**প্রণব দত্ত মজুমদার,**
কলকাতা-৪৮।

নোটবন্দির কারণে আলুচাষ মার খায়নি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এবছর বিভ্রান্তিকর প্রচার ছিল, টাকার অভাবে রবি চাষ মার খেয়েছে। ধামাধরা দু'একটি পত্রিকায় এই কথাগুলি প্রায়ই দেখতে পাই। কিন্তু নোট বাতিলের জন্য যে চাষবাসের ব্যাঘাত হয়নি তা বোধ হয় অতি বড় নির্বোধও বুঝতে পেরেছেন। তার উপর এবার প্রকৃতি দু'হাতে আশীর্বাদ করেছেন চাষিদের। ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি খেত ভর্তি আলু। এ রাজ্যের চাষিরা এই দুর্মূল্যের বাজারে উৎপন্ন ফসল অলাভজনক দামে বিক্রি করে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। তথাকথিত ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে লক্ষ লক্ষ আত্মহত্যাকারী কৃষকদের দলে শামিল হতে বাধ্য হবেন বঙ্গের আলুচাষিরা।

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর চাষিদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি আছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বঙ্গ জুড়ে মেলা করে চলেছেন, ছবি টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন। আসলে ওঁর মাথাব্যথা নেই, কারণ কলকাতার মানুষ প্রায় বিনে পয়সায় আলু খেতে পাবে। উনি কিন্তু ২০১৫ সালে আলুর দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে ভিন রাজ্যে রপ্তানি বন্ধ করতে লরি আটকে রেখেছিলেন। এমনকী দাম কম করার প্রয়াসে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু আজও একই পরিস্থিতি। আজকে চাষিদের বিপর্যয়ের দিনে তাঁর কোনোরূপ চিন্তা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ভিন রাজ্যে আলু যাওয়া বন্ধ করার মতো হঠকারি সিদ্ধান্তের বলি হয় বাংলার আলুচাষিরা। কৃষকরা বেঁচে আছে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানির উপর। আমাদের আলু চাষের উপর নির্ভর করে আছে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর তুঘলকি সিদ্ধান্তের জন্য ওইসব রাজ্যে, বিশেষ করে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যে আলু চাষের পত্তন করেন। ফলে আমাদের রাজ্য থেকে আলু যাওয়ার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের টাঙানো ছবি দেখে দিন গুনবো, নাকি তাঁর মতো ছবি আঁকবো, যা কিনা ১ কোটি ৮৬ লাখ টাকাতে বিক্রি হবে। আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরা বিডিও, ডিএম— এমনকী নবান্ন পর্যন্ত আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করব। সরকারকে আলু ৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে কিনতে বাধ্য করাব। যদি আমরা এই দর না পাই, তবে আগামী ১০ মার্চ গাড়িতে আলু নিয়ে গিয়ে হাওড়া ব্রিজ জ্যাম করে গোটা কলকাতা-সহ নবান্ন অচল করে তুলব। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, যেদিন আলুর দাম বেড়ে গিয়েছিল সেদিন দাম কমানোর জন্য রাস্তায় নেমেছিলেন, বাজারে গিয়ে সবজিওয়ালার কাছ থেকে আলু কেড়ে নিয়েছেন, কিন্তু আজ এই দুর্গতির দিনে আপনি একটি বাক্যও কেন খরচ করছেন না? আমরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে আলুর সরকারি সহায়ক মূল্য ৮০০ টাকা ঘোষণা করিয়েই ছাড়ব। প্রয়োজনে আমাদের আন্দোলন নবান্ন থেকে দিল্লি অবধি যাবে।

—**মনতোষ বসু,**
সভাপতি, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, বাঁকুড়া।

উপেক্ষিত হিন্দু সম্রাট হেমু

সন্দীপ চক্রবর্তী

মধ্যযুগে ভারতের ভাগ্য যাদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হোত তারা এ দেশের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। ইতিহাসকে বিকৃত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হবার পরও, আমাদের ইতিহাসবিদেরা যেসব হিন্দু সম্রাট মাতৃভূমিকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কথা চেপে গিয়ে বা উপেক্ষা করে সেই বিকৃতিকে আরও পুষ্ট করেছেন। আমরা জেনেছি সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান ছিলেন দিল্লির শেষ হিন্দু শাসক। এও জেনেছি, মুঘলদের সুদীর্ঘ শাসনকালে কোনো হিন্দু সম্রাট মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দিল্লিকে মুক্ত করতে পারেননি। অথচ হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য, সংক্ষেপে হেমু মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লিকে মুঘলদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং সর্বোপরি অল্পদিনের জন্য হলেও সম্রাট হয়েছিলেন। ভাগ্য হেমুর সহায় হলে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ভারতের ইতিহাসের 'পোস্টার বয়' আকবরকে ডাহা হারতে হোত।

সম্ভবত ভারতের সব থেকে জটিল এবং সংঘাতময় সময়ে হেমুর (১৫০১-১৫৫৬) জন্ম। এই সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা ভারতের পরবর্তী আড়াইশো বছরের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। হেমুর ছেলেবেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বস্তুত, ভারতীয় ইতিহাসবিদেরা হেমুর জন্মস্থান এবং ছেলেবেলার নাম নিয়েই দ্বিধান্বিত। কে কে ভরদ্বাজের মতে তার আসল নাম সম্ভবত বসন্তরাই কিংবা হেমরাই বা হেমরাজ অথবা হেমচন্দ্র ভার্গব। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'ধনসার সম্প্রদায়ের কোনো এক দরিদ্র পরিবারে হেমুর জন্ম। থাকতেন আলওয়ারের দক্ষিণে এক ছোট শহরে।' মুসলমান ঐতিহাসিক বদায়ুনি লিখেছেন, হেমু ছিলেন মেওয়াট তালুকের অন্তর্গত রিওয়ারি শহরের বাসিন্দা। সবজিবিক্রেতা হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন হেমু। একই সঙ্গে ধার্মিক এবং সাত্ত্বিক পরিবেশে বড়ো হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। শিখেছিলেন অনেকগুলো ভাষা। তার মধ্যে ছিল সংস্কৃত, পারসি এবং আরবি। ভালো পাটিগণিতও জানতেন। এছাড়া ছিল অশ্বারোহণ এবং কুস্তির শখ। ১৫৩০ সালে হেমু শেরশাহ্ সুরির কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংস্পর্শে আসেন। এরপরই শুরু হয় তাঁর জয়যাত্রা।

১৬শ শতকের গোড়ায় ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল আফগানদের দখলে ছিল। রাজপুতানা, ওড়িশা, অসম আর দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর শুধু ছিল স্বাধীন। দিল্লিতে তখন সুলতান ইব্রাহিম লোদির শাসন। উত্তর ভারতের প্রায় পুরোটাই তার দখলে। এই সময়, ১৫২৬ সালে, বাবর নামে মধ্য এশিয়ার এক যোদ্ধা সসৈন্যে ভারত আক্রমণ করে। কাবুল থেকে পঞ্জাব হয়ে বাবর সরাসরি দিল্লি পৌঁছে যায়। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (২১ এপ্রিল, ১৫২৬) বাবর ইব্রাহিম লোদি ও গোয়ালিয়র-রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের যৌথবাহিনীকে পরাজিত করে। এর কিছুদিন পর রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুতরা বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাজপুতদের সহযোগী হয়েছিল হাসান খান মোয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খানোয়ার এই যুদ্ধেও হিন্দু-আফগান যৌথ বাহিনী পরাজিত হয়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আফগানরা কেন হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দুরাই বা কীসের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিভেদ উপেক্ষা করে আফগানদের বিশ্বাস করেছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাবুল-কান্দাহার অঞ্চল গান্ধার নামে পরিচিত ছিল। সেই সময় থেকেই গান্ধার ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গবিশেষ। পরবর্তীকালে আরব সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতার কাছে নতি স্বীকার করে গান্ধারবাসীরা ধর্মত্যাগ করলেও হিন্দুদের সঙ্গে তাদের

আত্মীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাই বহিরাগত দখলদার মুঘলদের তুলনায় আফগানরা ছিল হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত কাছের। আবার মুঘলদের কাছে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আফগানদেরও হিন্দুর সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

যাই হোক, বাবরের মৃত্যুর পর তার ছেলে হুমায়ুন সম্রাট হলেন। এ সময় বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন এক আফগান— শেরখান। তিনি হুমায়ুনকে আক্রমণ করেছিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে হুমায়ুন দিল্লি ছেড়ে কাবুলে পালিয়ে যান। সিংহাসনে বসেন শেরশাহ। বাদশাহ্ হবার পর তার নাম হয় শেরশাহ্ সুরি।

হেমচন্দ্রের উত্থান এই সময়ে। তিনি তখন দিল্লী থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে রিওয়ারিতে থাকেন। শেরশাহের সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য জোগান দেন। ধীরে ধীরে তিনি বারুদের মশলা বিক্রিও শুরু করলেন। একদিন শেরশাহের ছেলে ইসমাইল শাহের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ১৫৪৫ সালে শেরশাহের মৃত্যুর পর ইসমাইল শাহই তখন তার উত্তরাধিকারী। হেমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ইসমাইল শাহ তাকে শাহাঞ্জ-ই-বাজার পদে নিয়োগ করলেন। পারসি কথাটির বাংলা অর্থ বাজার সরকার। সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার দায়িত্ব তার ওপর। বাজার সরকার হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার পর হেমচন্দ্রের পদোন্নতি ঘটল দারোগা-ই-চৌকি পদে। যার অর্থ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। ইসমাইল শাহের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। কতকটা স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি রাজধানী দিল্লি থেকে গোয়ালিয়রে স্থানান্তরিত করেন। এর কিছুদিন পর তিনি হেমচন্দ্রকে পঞ্জাবের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৫৫৩ সালে ইসমাইল শাহের মৃত্যু পর্যন্ত হেমচন্দ্র ওই পদে ছিলেন।

ইসমাইল শাহের মৃত্যুর পর তার ১২ বছরের ভাইপো ফিরোজকে খুন করে আদিল শাহ সিংহাসনে বসে। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অযোগ্য। শাসনভার হাতে নিয়েই তিনি হেমচন্দ্রকে ওয়াজির অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যাই হোক, ফিরোজের হত্যা এবং আদিল শাহের ক্রমাগত প্রশাসনিক ব্যর্থতায় বিরক্ত আফগান সর্দারেরা শীঘ্রই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আদিল শাহের সাম্রাজ্য চারটুকরো হয়ে যায়। সিকান্দার সুরি নিজেকে পঞ্জাবের সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে। দিল্লী ও আগ্রা দখল করে ইসলাইল সুরি। বাংলা যায় মহম্মদ সুরির দখলে। আদিল শাহের অধিকারে থাকে শুধু বিহার। এছাড়া আরও অনেক আফগান শাসক বিদ্রোহ করে। এই সময় হেমচন্দ্র প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের যোগ্যতা সব দিক থেকে প্রমাণ করেছিলেন। অজস্র যুদ্ধে তিনি প্রায় প্রতিটি বিদ্রোহী আফগানকে শায়েস্তা করেন। মহম্মদ সুরি যুদ্ধে নিহত হন। ইব্রাহিম শাহ্ সুরি দু'বার পরাস্ত হন। এতগুলো যুদ্ধ জিতে হেমচন্দ্র শুধু যে সাম্রাজ্য এবং তার অর্থনৈতিক বনেদ রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, আফগান সেনাবাহিনী তাঁর সম্পূর্ণ বশীভূত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে আফগান শাসকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খবর হুমায়ুনের কানে পৌঁছেছিল। শের শাহের কাছে পরাজিত হবার ১৫ বছর পর তিনি পারস্য (অধুনা ইরান) সম্রাটের সহযোগিতায় ভারতে ফিরে সিকান্দর সুরিকে যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন। সেটা ১৫৫৫। সাম্রাজ্যের ভিত শক্ত হবার আগেই ১৫৫৬ সালে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র তখন বাংলায় ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যু তার সামনে অভাবনীয় একটা সুযোগ এনে দিল। ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ হয়ে দিল্লির দিকে রওনা দিলেন। সেই সময় হেমচন্দ্রের যুদ্ধ পরিচালনা ও কৌশলের খ্যাতি এমনই ছিল যে স্রেফ 'হেমু আসছে', এই ভয়ে একাধিক মুঘল সেনাপতি এবং অজস্র সাধারণ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। হেমচন্দ্রের সেনাবাহিনী প্রায় বিনা বাধায় আগরায় প্রবেশ করে। চোখের পলকে শত্রুশিবির ধ্বংস করে হেমচন্দ্র আরও একবার তার হিন্দু-আফগান সৈন্যবাহিনীর সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর কোনো অযোগ্য শাসকের রবার স্ট্যাম্প হবার ইচ্ছে তার ছিল না, তিনি নিজেই দিল্লির সম্রাট হতে চাইলেন। সেনাপতিরা সানন্দে তাতে সম্মতি দিল।

ওদিকে, হুমায়ুনের বালকপুত্র জালালুদ্দিন আকবরের অভিভাবক এবং মুঘল সেনাপতি বৈরাম খাঁ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দিল্লির তৎকালীন শাসক তারদি বেগ খানের সঙ্গে একযোগে হেমচন্দ্রকে আক্রমণ করল। যুদ্ধ হয়েছিল এখনকার তুঘলকাবাদে। সেই যুদ্ধে হেমচন্দ্র ৩০০ হাতি ব্যবহার করছিলেন, কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগ ততটা সুসংগঠিত ছিল না। ফলে মুঘলরা অল্প চেষ্টায় ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ে। প্রায় ৩০০০ আফগান সৈন্য এবং শতাধিক হাতি নিহত হয়। জয় অনুমান করে মুঘল সৈন্যরা যখন শত্রুশিবিরের একাংশ ধ্বংস করতে ব্যস্ত ঠিক সেইসময় হেমচন্দ্র নিজে কয়েকজন বাছাই করা সৈন্য নিয়ে সরাসরি তারদি বেগ খানের দিকে অগ্রসর হন। সম্পূর্ণ অরক্ষিত তারদি বেগ খানকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেখে মুঘল সৈন্যরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

উলসে হেগ লিখেছেন, 'দিল্লি জয় করার পর হেমচন্দ্র এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে তার মনে হয়েছিল জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে।' ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন সেই সময় হিন্দুস্থানে সম্রাট হওয়ার যোগ্যতা তিনজনের ছিল। সুরিদের বাদ দিলে আকবর আর হেমচন্দ্রের। ১৫৫৬ সালের ৭ অক্টোবর, আফগান সর্দার এবং হিন্দু সেনাপতিদের উপস্থিতিতে হেমচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়। কে কে ভরদ্বাজ লিখেছেন, অভিষেক অনুষ্ঠানে হাজার হাজার অতিথি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ছিলেন রাজপুত এবং আফগান সর্দারেরা এবং অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষ। চারদিন ধরে উৎসব হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'হিন্দু রাজার অভিষেকে যা আবশ্যিক তার

সবই হয়েছিল। হেমচন্দ্রকে দুধে স্নান করানো থেকে শুরু করে রাজছত্র ধারণ— কিছুই বাদ পড়েনি।' রীতি মেনে হেমচন্দ্র পুরোহিতদের বস্ত্র প্রদান করেন এবং আমলাতন্ত্রকে পরিপুষ্ট করতে বেশ কিছু নিয়োগ করেন। হেমচন্দ্রের ভাই যুঝারু রাইকে আজমেড়ের শাসনভার অর্পণ করা হয়। ভাইপো রামাইয়া পান সেনাপ্রধানের পদ। এছাড়া হেমচন্দ্র তাঁর সমর্থকদের যোগ্যতা অনুযায়ী চৌধুরি এবং মুকুদ্দামের পদ প্রদান করেন।

৩৫০ বছর পর হেমচন্দ্রের মাধ্যমে উত্তর ভারত একজন ভারতীয় সম্রাট পেয়েছিল। আবুল ফজল তাঁর আকবরনামা গ্রন্থে লিখেছেন, দিল্লি জয়ের পর হেমচন্দ্র কাবুল ও কান্দাহার জয়েরও পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীতে আফগানদের পাশাপাশি ভারতীয়দের আরও বেশি সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের দিল্লিজয় এবং রাজ্যাভিষেক মুঘলদের চিন্তায় ফেলে দিল। মুঘল সেনাপতিরা আকবরকে কাবুলে চলে গিয়ে হুমায়ুনের মতো উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ তখনই হেমচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ চাইছিলেন। তিনি জানতেন যুদ্ধে মুঘলদের পরাজয় হতে পারে। তাই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আট মাইল দূরে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাতে বাহিনী পরাজিত হলে সময়মতো কাবুলে পালাতে পারেন।

১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর হেমচন্দ্র আর মুঘলদের মধ্যে ঐতিহাসিক পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হলো। এই সেই পানিপথ, ৩০ বছর আগে যেখানে আকবরের পিতামহ বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করেছিলেন। নিজেদের রণকৌশল এবং বাহিনীর শৌর্যবীর্যের ওপর বিশেষ ভরসা রাখতে না পেরে বৈরাম খাঁ ইসলামের দোহাই দিয়ে সৈন্যদের উত্তেজিত করেছিলেন। এদিকে, সম্রাট হেমচন্দ্র তাঁর প্রধান সেনাপতিদের রাজধানীর প্রহরায় রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক হেমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে চরম ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, যুদ্ধ শুরু হলো। হেমচন্দ্র হাতির পিঠে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। সব কিছুই ঘটছিল তাঁর অনুকূলে। কিন্তু ভাগ্য তার সহায় ছিল না। হঠাৎই কোথা থেকে একটা তির এসে তাঁর চোখে লাগে। অসমসাহসী হেমচন্দ্র চোখ থেকে তির বের করে বাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বিপুল রক্তক্ষরণের জন্য দুর্বল হেমচন্দ্র কিছুক্ষণের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় দৃশ্যপট। সম্রাটকে ওইভাবে লুটিয়ে পড়তে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সৈন্যরা পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে যায়। প্রধান সেনাপতিরা সকলে রাজধানীতে থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে এমন কেউ ছিল না যিনি এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফল যা হবার তাই হয়েছিল। যে যুদ্ধ সহজেই জেতা যেত তা বিশ্রীভাবে হেরে গেলেন হেমচন্দ্র। অচৈতন্য, মৃতপ্রায় হেমচন্দ্রকে শাহ্‌কুলি খান টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল আকবরের শিবিরে। সেখানে বৈরাম খাঁ তাঁর শিরশ্ছেদন করেন।

হেমচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক কাবুলের দিল্লি দরওয়াজার সামনে তিনদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। শরীর দাহ করা হয় পুরনো কেল্লায়। ঠিক সেখানে, যেখানে হেমচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্রের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে খুন করা হয় হেমচন্দ্রের আফগান ও ভারতীয় সমর্থক-সহ অসংখ্য নিরীহ নরনারীকে। হেমচন্দ্রের অনুগামীদের হাড় দিয়ে মসজিদের গম্বুজ বানানো হয়েছিল।

এখনও এরকম একটি গম্বুজের ছবি পানিপথের জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬০ বছর পর জাহাঙ্গিরের আমলে ব্রিটিশ পর্যটক পিটার মান্ডি ভারতে এসে মানুষের হাড়ের তৈরি গম্বুজ দেখেছিলেন।

ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ কেউ হেমচন্দ্রের পরাজয় ও অকালমৃত্যুকে ভাগ্যবিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এটা শুধু হেমচন্দ্রের নয় সমগ্র ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়। বিশেষ করে যখন দেখি, ৩৫০ বছর ধরে ইসলামি সন্ত্রাসের আঁচে সেদ্ধ হবার পর উত্তর ভারতের মানুষ হেমচন্দ্রের মধ্যে রূপকথার নোয়াকে দেখেছিলেন। আশা করেছিলেন নোয়া তার নৌকায় সবাইকে তুলে নিয়ে বর্বর বিধর্মীর অত্যাচার থেকে তাদের মুক্তি দেবেন। কিন্তু সামান্যের জন্য তা হয়নি। এরপর মুঘলরা ভারতে আরও জাঁকিয়ে বসল। ১৭০৯ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের উচ্ছেদ করার কথা ভাবা যায়নি। ১৭৩৭ সালে মারাঠাদের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী দিল্লি দখল করল। মুক্তি পেল উত্তর ভারত।

দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হেমচন্দ্র হেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাই বলে তাঁর বীরত্বময় প্রয়াসকে কখনওই ছোট করে দেখা যায় না। ঐতিহাসিক কে কে ভরদ্বাজ হেমচন্দ্রকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দু'জনেই দরিদ্র পরিবারে জন্মেছেন। দু'জনেই জিতেছেন একের পর এক যুদ্ধ। দু'জনেই নিজেদের প্রতিভা পরিশ্রম ও বীরত্বকে ভিত্তি করে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছেন। আবার দু'জনেই জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হেরেও গিয়েছেন। দু'জনের মিল যেমন আছে তেমনি অমিলও আছে। ফ্রান্সে তো বটেই, বলতে গেলে সারা পৃথিবীতেই নেপোলিয়ান শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

অন্যদিকে, হতভাগ্য হেমচন্দ্রকে তাঁর নিজের দেশই মনে রাখেনি। এ যে কত বড়ো লজ্জা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতীয়দের এই আত্মঘাতী মানসিকতার দ্রুত অবসান প্রয়োজন। ইতিহাস-বিমুখ হওয়ার অর্থ নিজের মেরুদণ্ডটিকে বন্ধক রাখা। আর এ কথা কে না জানে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পক্ষে জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া শুধু কঠিন নয়, এক কথায় অসম্ভব।

মহাকাশে সেলফি পিএসএলভি-র

স্মার্টফোনের দৌলতে সেলফি অর্থাৎ নিজের ছবি নিজে তোলার ব্যাপারটি আজকাল জলভাতের মতো হয়ে গেছে। দৌরাত্ম্য বললেও বেশি বলা হয় না। কিন্তু তাই বলে মহাকাশে

সেলফি! হ্যাঁ, এমনি বিস্ময়কর কাণ্ডটি করেছে ইসরোর মহাকাশ যান পিএসএলভি-সি ৩৭। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ১০৪টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে এই মহাকাশ যান। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করার পর থেকে একের পর এক নিজস্বী পাঠাতে থাকে পিএসএলভি। প্রথম স্টেজ, দ্বিতীয় স্টেজ সম্পূর্ণ হওয়ার ও একেকটি স্যাটেলাইট বিচ্ছিন্ন হওয়ার ছবি।

পিএসএলভি-র পুরো নাম পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভিহিক্যাল। যা মহাকাশ উৎক্ষেপণে একের পর এক সফলতা অর্জন করে চলেছে। যানটি লম্বায় ৪৪.৪ মিটার ও ব্যাসার্ধ ২.৪ মিটার। ওজন ২৩০ টন। এর আগে ভারতের দু'টি সফল উৎক্ষেপণ এই যানটির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৪ সালে হয় চন্দ্রায়ন ও ২০১৪ সালে হয় মঙ্গলায়ন। এই দু'টি উৎক্ষেপণের পরই ভারত মহাকাশ গবেষণায় বিশ্বে চতুর্থ স্থানে উঠে আসে। কিন্তু পিএসএলভি-র মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এবার যা করলো তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। একসঙ্গে ১০৪টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়ে রেকর্ড তৈরি করেছে। এর আগে ২০০৮ সালে একসঙ্গে ১০টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিল এই রকেট। এরপর গত বছর পাড়ি দেয় ২০ উপগ্রহ নিয়ে। এবার একধাক্কায় ১০৪টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলো ভারত। এতোদিন পর্যন্ত উপগ্রহ উপস্থাপনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল রাশিয়ার। ২০১৪ সালে তারা একসঙ্গে ৩৭টি উপগ্রহ পাঠিয়েছিল। পিএসএলভি-র সৌজন্যে ভারত সেই রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভারতের হাতে এখন সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড। উৎক্ষেপণের ১৭ মিনিট ২৯ সেকেন্ড পর প্রথম উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০৫ কিলোমিটার উপরে মহাকাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপিত হয়। একে একে সব উপগ্রহগুলি স্থাপিত হতে সময় লাগে ২৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড। স্থাপনের পরই সব উপগ্রহগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। পিএসএলভি-র এটি ৩৯ তম সফল অভিযান।

এখনো পর্যন্ত ভারত মোট ২০৬টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। যার মধ্যে ১৮০টি বিদেশি। এবারের উৎক্ষেপণে ১০৪টির মধ্যে ১০১টি উপগ্রহই বিদেশের। যে সমস্ত দেশের উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে সেগুলি হলো আমেরিকা, ইজরায়েল, কাজাকাস্তান, নেদারল্যান্ড এবং আরব আমিরশাহি। বিভিন্ন দেশের এই উগ্রহগুলি মহাকাশে পাঠিয়ে ভারতের ৬০০ কোটি টাকা আয়ের সুযোগ হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতের এই সফল উৎক্ষেপণের প্রশংসা করেছে।

যার মাধ্যমে এই উৎক্ষেপণ সম্ভবপর হয়েছে, অভিনন্দন জানিয়েছে সেই পিএসএলভি-সি ৩৭ কে। অনেকে বলছেন পিএসএলভি হলো মহাকাশের বিরাট কোহলি।

।। শুভজিৎ দাস।।

ভারতের পথে পথে

বারাণসী

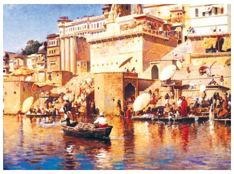

ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী বারাণসী। পৃথিবীর প্রাচীনতম জনপদগুলির মধ্যে অন্যতম এই শহর। কিংবদন্তী অনুসারে স্বয়ং শিব এই শহরের পত্তন করেন। ভারতবর্ষের উৎকর্ষ সাধন এই শহরকে কেন্দ্র করে হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বারাণসী একটি উৎকর্ষ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তুলসীদাসের রামচরিতমানস সহ বহু বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয় এই শহরে। বারাণসীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম। এখানে বিকাশ লাভ করেছিল ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। মানুষের বিশ্বাস বারাণসী হলো মোক্ষ ক্ষেত্র। এছাড়াও এখানে রয়েছে একটি শক্তিপীঠ ও অসংখ্য মন্দির, যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের নানা কাহিনি। গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা এই শহরের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনা ভারতকে সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে গেছে। বারাণসীর দর্শনীয় স্থানগুলি হলো দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বনাথ মন্দির, রামনগর দুর্গ ইত্যাদি। এটি বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত।

এসো সংস্কৃত শিখি

अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति।
অন্য কোনো কাজ নেই।

मम वचनं शृणोतु।
আমার কথা শুনুন।

एतत् सत्यं खलु?
এটা কি সত্যি?

तद् अहमपि जानामि।
তা আমিও জানি।

एतावद् आवश्यकं न।
অতটা দরকার নেই।

ভালো কথা

ছোট উদ্যোগে রক্তদান

সিউড়ীতে তিলপাড়া এলাকায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আমাদের শাখার নাম ডাক্তারজী শাখা। অনেকদিন ধরেই আমাদের শাখায় একটি রক্তদান শিবির করার কথা হচ্ছিল। অবশেষে গত ৩ ফেব্রুয়ারি তা হলো। সেদিন সকাল থেকেই শাখার দাদাদের ব্যস্ততা ছিল। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস আনা, রক্তদাতাদের ডেকে আনা, আরোও কত কাজ। অবশ্য কয়েকদিন আগে থেকেই রক্তদান করার জন্য পাড়ার বড়দের অনুরোধ করা হয়েছিল। সেদিন মোট ১৪ জন রক্তদান করে। রক্তদাতার সংখ্যা কম হলেও উৎসাহের খামতি ছিল না। এক দাদা রক্ত দেওয়ার পরই অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর মাথায় জল ঢাললে ঠিক হয়। ছোট উদ্যোগে আমাদের প্রথম রক্তদান সফল হওয়ায় সবাই খুব খুশি। আগামী বছর আবার এই রক্তদানের আয়োজন করা হবে।

সূর্য চট্টরাজ, ষষ্ঠ শ্রেণী, সিউড়ী।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল র্ণা স্কা র
(২) হ র ক কু

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ল রী তা পু পা
(২) ত মা রী ঘৃ কু

১৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) বীণাবাদিনী (২) পর্বতারোহী

১৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) গতানুগতিক (২) কাগজকলম

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯ (২) প্রীতম মণ্ডল, সিউড়ী, বীরভূম
(৩) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা (৪) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

অঙ্গনা

নারীমুক্তির চেতনাদাত্রী আশাপূর্ণা দেবী

রূপশ্রী দত্ত

আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যজগতে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। তাঁর জন্ম ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারি এবং মৃত্যু ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই।

তিনি বহুজনপরিবৃত উত্তর কলকাতা এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে মেয়েদের অদ্ভুত এক ঘেরাটোপের মধ্যে বসবাস করতে হোত। বিদ্যালয়শিক্ষা তো নয়ই, বাড়িতেই বই পড়ে আশাপূর্ণাকে স্ব-শিক্ষিত হতে হয়েছিল। ভায়েদের সামনে বসে শুনে শুনে পাঠ্যবিষয় তিনি শিখতেন।

এই নারীমুক্তি বাসনার প্রেক্ষিতেই তাঁর ট্রিলজি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। এটি আসলে তিনটি পৃথক উপন্যাসের সমাহার। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭) ও 'বকুল কথা'। এটি সর্বভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়।

গত শতকের চারের দশকে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙালির অন্তঃপুরেও এক বিপ্লব দানা বাঁধতে শুরু করে। অন্তঃপুরিকাদের চারদেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধতা, বাইরে যাওয়ায় বিধিনিষেধ, লেখাপড়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা— তাদের পর্যুদস্ত করেছিল। এছাড়া পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া নানা আদেশ অন্তঃপুরের নারীদের সংবরণ ও সংহরণ-মন্ত্রের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। আশাপূর্ণার নিজের জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চরিত কাহিনিতে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতীর অন্তরে প্রথম জাগে এই নারীমুক্তির চেতনা। যুক্তিবুদ্ধির নিরিখেই সত্যবতীর মনে সবকিছু যাচাইয়ের এক বিরল প্রবণতা ছিল। নির্বিচারে সব অন্যায় মুখ বুজে নেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাতে হয়তো সংঘাত বাঁধত, কিন্তু সত্যবতী কোনো অন্যায়ের সঙ্গেই আপোশ করেননি। সেইজন্যই শেষ জীবনে তিনি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও পরিবেশ থেকে দূরে চলে যান। এমনকী স্বামীকেও ছেড়ে তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন।

সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতা জন্মসূত্রে এই মানসিক দৃঢ়তা লাভ করেছিল। বহুজনপরিবৃত সংসারে গোঁড়ামির একচেটিয়া আধিপত্য নারীদের সব কিছুই নিষেধের গণ্ডীতে বেঁধে রেখেছিল। সুবর্ণলতা তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ত, আবৃত্তি করত, দিনপঞ্জী লিখত। নির্মীয়মাণ বাড়িতে তার চাহিদা ছিল বড় রাস্তা দেখার জন্য দক্ষিণের বারান্দা। সেটুকু থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। দিনপঞ্জীর মুদ্রিত রূপ দেখে পরিজনদের তির্যক মন্তব্যে সে অভিমানাহত হয়ে তা ভস্মীভূত করেছিল। সুবর্ণলতা পরিশেষে ভরা সংসার ও স্বামীকে রেখে পরলোকে পাড়ি দিল। সুবর্ণলতা নারীমুক্তি সংগ্রামে চেতনাকে যেন অনেকটাই অগ্রসর করে দিয়েছিল। আর সুবর্ণলতার সেই দিনপঞ্জীর ভস্মাবশেষ থেকেই যেন ফিনিক্স পাখির মতোই সুবর্ণলতার কন্যা বকুলের আগমন।

বকুল সেই ধারারই শেষ উত্তরাধিকারিণী। নারীজাগরণের এক পরিপূর্ণ প্রতীক। সে 'অনামিকা দেবী' ছদ্মনামে তার মাতা, মাতামহী ও তাঁর নিজের জীবনকাহিনি লেখে।

আশাপূর্ণার ব্যক্তিজীবনের অভ্রান্ত প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের নারীরা সকলেই মুক্তির আলোক-পিয়াসিনী। অবিচলিত চিত্তে, দৃঢ়তার সঙ্গে তারা ন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়। রক্ষণশীলতার নামে প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তারা মূর্তিমতী রণচণ্ডিকা। শুধু পুরুষ নয়, অন্তঃপুরের সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী নারীও এই প্রতিক্রিয়াশীলতার মন্ত্রেই দীক্ষিত। তাঁদের মধ্যেও কোনো আকাঙ্ক্ষিত উদারতা ছিল না। তাই আলোকপ্রাপ্তা, অপেক্ষাকৃত আধুনিকমনস্কা নববধূরা পরিবারে এক মানসিক সংঘাতের শিকার হোত। আজকের নারীর উন্নয়ন ও উজ্জীবনে আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির অবদান কম নয়। আজও তাঁর উপন্যাসগুলি নারীসমাজকে মুক্তির চেতনায় জারিত করে। ■

কমিউনিস্টদের খুনি চেহারা দেশের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে

অতিথি কলম

লোকেন্দ্র সিংহ

বিচিত্র প্রদেশ কেরল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরপুর এই রাজ্যকে এক সময় 'ঈশ্বরের আপন দেশ' নামে অভিহিত করা হোত। সেই কেরলকে জাতপাতে দীর্ণ দেখে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ মনের দুঃখে 'পাগলাগারদ' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই কেরলপ্রদেশ এখন কয়েক দশক থেকে লাল সন্ত্রাসের থাবায় রক্তাক্ত। রাজ্যে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতাপার্টির কার্যকর্তাদের নিশানা করা চলছে। বামপন্থী হিংসার জন্য কেরলের বদনাম সারাদেশের মানুষ ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু গত কয়েক দশক থেকে এই হিংসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে যখন কমিউনিস্ট পার্টির সরকার ক্ষমতায় থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা মনে করেন রাজ্যে এই কমিউনিস্ট হিংসার পিছনে মুখ্যমন্ত্রী পি বিজয়নের মদত রয়েছে। এখন পর্যন্ত যতগুলি ঘটনা ঘটেছে তাতে সিপিআই (এম)-এর নেতাদের প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে। তবু রাজ্যসরকার এই হিংসা থামানোর জন্য কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং অভিযুক্তদের পাশেই দাঁড়িয়েছে। এজন্যই রাজনৈতিক হিংসায় মুখ্যমন্ত্রী পি বিজয়ন-সহ তাঁর সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ মানুষের সামনে এসে পড়েছে।

অ্যাম্বুলেন্সে সন্তোষের শব-সহ নাগরিকদের বিক্ষোভ।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রমাণিত তথ্য যে, যেখানেই কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়েছে, সেখানেই বিরোধী মতাদর্শ খতম করার জন্য কমিউনিস্টরা রক্তে মাটি লাল করে দিয়েছে। বামপন্থী ভাবনার মূল কথা হলো স্বেচ্ছাচারিতা এবং হিংসা। কমিউনিস্টরা রাশিয়া থেকে শুরু করে চীন, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ, কোরিয়া, কিউবা এবং ভারতের লাল করিডোর নামে অভিহিত এলাকায় ঘোর হিংসা ও অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি করেছে। তারা নিজেদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য মতাদর্শের মানুষদের খুন করার জন্য প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবাংলা এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিন দশক ধরে এরা পশ্চিমবাংলাকে রক্তাক্ত করেছে। এখন কেরলে এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কেরলে বামপন্থীরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতাপার্টির কার্যকর্তাদের শুধু নয়, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তা কোনো সভ্য সমাজের পক্ষে শুভ নয়।

বিস্ময়া : লাল সন্ত্রাসে পীড়িত এক নিষ্পাপ বালিকা

এক প্রতিভাবান নিষ্পাপ বালিকা বিস্ময়া বামপন্থী সন্ত্রাসের কারণে অনাথ হয়েছে। বিস্ময়ার বাবা মুল্লাপরম্ এজুথান সন্তোষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা ছিলেন। তাঁকে গত ২৮ জানুয়ারি কমিউনিস্ট গুণ্ডারা হত্যা করে। বিস্ময়া তার বাবাকে খুব ভালোবাসতো। এখনো সব সময় শুধু বাবার কথাই বলে চলেছে। বাবার স্মরণে সে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছে। এই কবিতা যে-কোনো সংবেদনশীল ব্যক্তির হৃদয় উদ্বেল করে দিতে পারে। এই নিষ্পাপ বালিকা এশিয়া-নেট-টেলিভিশন চ্যানেলে প্রশ্নোত্তরের এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। হাসতে হাসতে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে দর্শকের মন জয় করে নেয়। যখন মার্কসবাদী গুণ্ডারা এই নিষ্পাপ বালিকার মাথার ওপর থেকে তার বাবার স্নেহ-ছায়া ছিনিয়ে নেয়, তখন কেউ একজন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ময়ার হাসি মুখের ছবি পোস্ট করে। খুব তাড়াতাড়ি সেই ফটো ভাইরাল হয়ে যায় এবং বিস্ময়া লাল সন্ত্রাসে পীড়িত শিশুদের প্রতিনিধি হয়ে যায়।

পিনারাই বিজয়ন

কেরলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও সঙ্ঘের কার্যকতাদের হত্যার জন্য দোষী। বিজয়ন ও কোড়িয়রি বালকৃষ্ণনের নেতৃত্বে পলিটব্যুরোর সদস্যরা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক বড়িক্কল রামকৃষ্ণকে হত্যা করে ১৯৬৯ সালের ২৮ এপ্রিল। কন্নুর জেলায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়ি। পুলিশ ইন্সপেক্টরের মতে, ২০১৬-র ১ মে থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কন্নুর জেলায় রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন ৩০১ জন।

কোঝিকোড়ের ঘটনা কমিউনিস্টদের বর্বরতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। কোঝিকোড়ের পলক্কড়ে গত ২৮ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে কমিউনিস্ট গুণ্ডারা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা চাদঙ্কলয়িল রাধাকৃষ্ণানের বাড়িতে পেট্রলবোমা ছোড়ে, যখন বাড়ির লোকেরা ঘুমিয়ে ছিল। ৪৪ বর্ষীয় রাধাকৃষ্ণান, তাঁর দাদা কন্নন ও বৌদি বিমলা আগুনে ঝলসে যান। সেদিনই রাধাকৃষ্ণানের মৃত্যু হয়। একদিন পরে হাসপাতালে তাঁর দাদা ও বৌদির মৃত্যু হয়। এই এলাকা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দের নির্বাচন ক্ষেত্র। রাধাকৃষ্ণান ও তাঁর দাদা কন্ননের সক্রিয়তায় সেখানে সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে ভীত বামপন্থীরা এই পরিবারটিকে খতম করে দিয়েছে। বামপন্থী নৃশংসতার আর এক উদাহরণ চলতি বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মল্লাপুরম্ জেলার ঘটনা। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সুরেশ তাঁর পরিবার-সহ গাড়িতে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। সে সময় মল্লাপুরম্ জেলার তিরুতের কাছে কমিউনিস্ট গুণ্ডারা তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে। গাড়ির দরজা ভেঙে কোল থেকে তাঁর দশ মাসের শিশুকে পা ধরে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেয়। সুরেশের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালায়। এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে, কেরলের 'সর্বহারার শাসন' নয়, জঙ্গলরাজ চলছে।

এই জঙ্গলরাজে মহিলা ও শিশুরাও সুরক্ষিত নয়। চিন্তার বিষয় যে, এই ঘটনাগুলি জাতীয় প্রচারমাধ্যম এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দেখেও না দেখার ভান করছেন অথবা নিজেরা মনগড়া তথ্য পরিবেশন করে সত্য ঘটনা বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। কেরলের কন্নুর লাল সন্ত্রাসের জন্য কুখ্যাত। বলা হয় বিরোধী মতাদর্শের লোকদের কৌশলে হত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কমিউনিস্টরা গর্বভরে 'কন্নর মডেল' খাড়া করেছে। এখন যখন রাজ্যে মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টির সরকার রয়েছে, তখন সারা রাজ্যে এই কন্নুর মডেল চালাবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় এভাবে তারা 'কেশপুর মডেল' চালিয়েছিল। গত ১৮ জানুয়ারি কন্নুরে ভারতীয় জনতাপার্টির কার্যকর্তা মুল্লপরম্ এজুথান সন্তোষকে হত্যা করেছে কমিউনিস্ট গুণ্ডারা।

মার্কসবাদী গুণ্ডারা সুযোগটা নিয়েছিল রাতে যখন সন্তোষ বাড়িতে একা ছিলেন। এভাবে গোপনে লুকিয়ে সঙ্ঘ ও বিজেপি কার্যকর্তাদের হত্যার ফলে স্থানীয় জনতার মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রতি ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে দেখা যাচ্ছে। সন্তোষের হত্যার পর কেরলে জঙ্গলরাজ ও লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ সংঘটিত করার সংকল্প করেছে সঙ্ঘ ও বিজেপি।

গত বছর হায়দরাবাদে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠকে কমিউনিস্টদের দ্বারা হত্যার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্র ও কেরল সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির হিংসাত্মক কাজকর্মের বিরুদ্ধে দেশবাসীর কাছে জনমত নির্মাণের আবেদন জানানো হয়।। এর ফলে বামপন্থী বিচারধারার খুনি চেহারা সারাদেশের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

(লেখক হিন্দি সংবাদপত্রের বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

কেরলে লাল সন্ত্রাসের ইতিহাস

কেরলে লাল সন্ত্রাসের তালিকা দীর্ঘ। স্বাধীনতার পর অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সবচেয়ে বড় হামলা চালায় সঙ্ঘের ওপর ১৯৪৮ সালে। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী যখন স্বয়ংসেবকদের একটি বৈঠক নিচ্ছিলেন তখন কমিউনিস্ট গুণ্ডারা হামলা চালায়। এরপর ১৯৫২ সালে অলপ্পুজায় শ্রীগুরুজীর বৈঠকে কমিউনিস্টরা হামলা চালায়। ১৯৬৯ সালে ত্রিশূরে শ্রীকেরল বর্মা কলেজে স্বামী চিন্ময়ানন্দজী স্থানীয় যুবকদের সামনে যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তাঁর ভাষণ বন্ধ করার জন্য কমিউনিস্টরা পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ চালায়। স্বয়ংসেবকরা বড় বিপদের হাত থেকে স্বামীজীকে রক্ষা করেন। ১৯৭০ সালে এর্নাকুলম্ জেলায় পরুরে কমিউনিস্ট গুণ্ডারা সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক বেলিয়াথনাদু চন্দ্রনকে হত্যা করে। ১৯৭৩-এ ত্রিশূর জেলায় নলেঙ্কারায় মণ্ডল কার্যবাহ শঙ্করনারায়ণকে হত্যা করে। ১৯৭৪-এ কোচিতে সঙ্ঘের মণ্ডল কার্যবাহ সুধীন্দ্রকে হত্যা করে। ১৯৭৮-এ কন্নুর জেলার তলাসেরিতে একটি শাখার মুখ্যশিক্ষক চন্দ্রন-সহ কয়েকজন কিশোর ছাত্র ও কার্যকর্তাকে হত্যা করে। ১৯৮০ সালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা গঙ্গাধরন ও বিজেপির গোপালকৃষ্ণনকে হত্যা করে। ১৯৮১ সালে খণ্ড কার্যবাহ করিমবিল সতীশন, ১৯৮২-তে কুট্টনাড্ডুতে খণ্ড কার্যবাহ বিশ্বম্ভরম্ এবং ১৯৮৬-তে কন্নুর জেলার বিজেপির সচিব পন্নয়নূর চন্দ্রনকে হত্যা করে। এভাবেই ১৯৮৪ সালে কন্নুর জেলার সহ-জেলা কার্যবাহ সদানন্দ মাস্টারকে দু'পা কেটে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে কমিউনিস্ট গুণ্ডারা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

অসম বাজেটের জনপ্রিয় প্রস্তাবগুলি বাস্তবে কতটা কার্যকরী হবে

ধর্মানন্দ দেব

বাজেট মরশুম এবার বছরের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ হয়ে আলোচনা প্রায় শেষের পথে। আপাততভাবে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে 'চমক' বলে কোনো বস্তু আছে বলে মনে হয়নি। একেবারে 'সাদামাঠা বাজেট'। হ্যাঁ আমি অর্থনীতির ছাত্র নই, তাই শেয়ার বাজারের কথা আমার মাথায় বোধহয় ঢুকছে না। কেননা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর থেকেই শেয়ার বাজারের সূচক কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী। আর তার পিছনে কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাজেটে নাকি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বৃদ্ধির পথে দেশকে নিয়ে যাওয়ার রসদ রয়েছে। যাই হোক, তারই মধ্যে গত ৭ ফেব্রুয়ারি অসম রাজ্যের ২০১৬-১৭ বিত্তীয় বর্ষের জন্য রাজ্য বিধানসভায় ১৩৬ পৃষ্ঠার বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসম রাজ্যের বিধানসভা সম্প্রতি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, কারণ ৫ বছরের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর আইনসভা কার্যত সরকারের আজ্ঞাবহ ভূমিকাই পালন করে। সহজভাবে বলা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ। বিগত কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা গেছে রাজ্যের জনগণ আর রাজ্যের বিধানসভাগুলির দিকে ফিরেও তাকান না। কারণ রাজ্য সরকার সংখ্যার জোরে প্রতিপদে অবজ্ঞা করতে পারে বিরোধীদের, পাশ করিয়ে নিতে পারে সবকিছু --- বাজেট থেকে শুরু করে যে-কোনো আইন বা বিল। এসব জানা সত্ত্বেও কিছুটা আগ্রহ বা আকর্ষণ বজায় ছিল উত্তপ্ত বিতর্কে বা সারগর্ভ আলোচনায়। সেসব বালাই কবেই চুকেবুকে গিয়েছে। অসমের গত পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের সময়ের দিকে যদি আমরা ফিরে দেখি, তখন দেখব প্রতিদিন গগৈ সরকার বনাম বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে এক রোমাঞ্চকর ম্যাচ হয়েছিল। ফলস্বরূপ ক্ষতি হয়েছে রাজ্যবাসীর অর্থাৎ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল রাজ্যের উন্নয়ন। সে যাইহোক,

রাজ্যের গদিতে পট পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতায় আসে বিজেপি। অর্থমন্ত্রক, শিক্ষামন্ত্রক-সহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পান তরুণ গগৈর এককালের বিশেষ সেনাপতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর তরুণ গগৈ বর্তমানে বসেন বিরোধী আসনে। অর্থাৎ তকমা লাগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। তাই রাজ্যের জনসাধারণের কাছে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট নিয়ে একটা কৌতূহল লক্ষ্য করা গেছে এবং মানুষের মনে এক আশার সঞ্চার হয়েছে। তাই বাজেট প্রকাশ হওয়ার পর দীর্ঘ বাজেট ওয়াটসঅ্যাপে মানুষের হাতে হাতে চলে আসে। ওয়েবসাইট থেকেও মানুষ ডাউনলোড করে দেখছেন। পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনা চলছে। অফিস- আদালতে রাজ্য বাজেট নিয়ে অল্প বিস্তর আলোচনা চলছে। এটা রাজ্যের জন্য একটা ভাল লক্ষণ বলা যায়। অবশ্য বাজেটেও ছিল জনগণের মন জয়ের অসংখ্য রসদ এবং বিভিন্ন যোজনার প্রস্তাব। সরকার পক্ষেরও কোনো খামতি রাখা হয়নি। ছিল বাজেটে বিভিন্ন যোজনার প্রস্তাব। কিন্তু বাস্তবে সেই যোজনাগুলি কেমন করে কার্যকরী হবে তার কোনো রূপরেখা নেই বাজেটে। বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা বহির্ভূত তহবিলের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের সবচাইতে অবহেলিত চা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। একই সঙ্গে রাজ্যের দু'টি পাহাড়ি জেলা কিছুটা হলেও বাজেটে গুরুত্ব পেয়েছে। রাজ্যে কৃষকদের ঋণ সুদবিহীন করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে কৃষক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় কি? পেতে হলে ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে কতবার দ্বারস্থ হতে হয়? তাই সুদবিহীন করে কতটুকু ঋণ রাজ্যে কৃষকদের দেওয়া হবে সেটাই বড় প্রশ্ন। নতুন 'কর' আরোপ না করেও রাজ্য বাজেটে এতো যোজনার প্রস্তাব সত্যিকার অর্থে ঐতিহাসিক। ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ যোজনার একসঙ্গে নামকরণ করা হয়েছে— 'অষ্টাদশ মুক্তার উন্নয়নী মালা'। এই যোজনাগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—

অসম সরকার যদি বাজেটের প্রস্তাবিত যোজনাগুলি বাস্তবে কার্যকরী করে তবে অসমের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাবে। গড়ে উঠতে পারে এক সোনার অসম।

(১) SVAYEM (Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment) Yojana– এই যোজনার অন্তর্গত ১ লক্ষ যুবক-যুবতী-কে উদ্যোগ তথা বাণিজ্যের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা নতুন ব্যবসার জন্য এবং চলতি ব্যবসার জন্য সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে।(২) Kanaklata Mahila Sabalikaran Yojana (KAMS)– এই যোজনার অন্তর্গত ১ লক্ষ মহিলা আত্মসহায়ক দল গঠন করে ৫ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। (৩) Gene Bank for Indigenous Fish (GBIF)– বাজেটে এই যোজনার জন্য রাখা হয়েছে ১১.৩৬ কোটি টাকা। (৪) Reforms In Mid-Day Meal– বাজেটে মধ্যাহ্ন ভোজন যোজনার সংস্কারের করে রাজ্যের প্রাইমারি বিদ্যালয়ে থাকা ৪২.৬১ লক্ষ শিশুর মধ্যে সপ্তাহে দু'দিন করে ডিম খাওয়ানোর প্রস্তাব রাখা হয় এবং সেই খাতে বছরে ১৩০ কোটি খরচের প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং মধ্যাহ্ন ভোজন যোজনায় থাকা প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব।(৫) Price Stabilisation Fund-বাজেটে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৫০ কোটি টাকার এক তহবিল রাখার প্রস্তাব রাখা হয়। (৬) Financial Incentives For Ujwala– বাজেটে দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাস করা পরিবারের জন্য বিনামূল্যে রন্ধন গ্যাস সংযোগ দেওয়ার জন্য এই যোজনা।এই যোজনায় দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাস করা প্রতিটি পরিবার রন্ধন গ্যাস সংযোগের জন্য পাবে ১ হাজার টাকা করে। আর এই যোজনার জন্য ৫ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়।এছাড়াও কেন্দ্রীয় উজলা যোজনার সহায়তা পাবে।

দেশে বর্তমান গ্রামে বসবাস করা লোক হচ্ছে ৬৮ শতাংশ। যদি শুধু অসম রাজ্যে গ্রামে বসবাস করা লোকের সংখ্যা দেখি তখন দেখা যাবে ৮৪ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে। বাজেটে গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন যোজনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাই বাজেটকে জনমুখী বলতে বাধা নেই। বিজেপি দলের ভিশন ডকুমেন্টের সঙ্গেও মিল রেখে বাজেট পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ওইসব যোজনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হয়েছে সেই অর্থ দিয়ে কি সব যোজনা রাজ্যে কার্যকরী করে তোলা সম্ভব? তরুণ গগৈ সরকারের শেষ বাজেট অর্থাৎ ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৭৪,৮১৮.৪৯ (সংযোজিত) কোটি টাকা বণ্টন করা হয়। এই পরিমাণ অর্থের সঙ্গে বর্তমান বাজেটে (মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে) অর্থের প্রস্তাব প্রায় সমান। বাজেটে রাজ্যের বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করে অনুমান নির্ভর আয় ধরা হয়েছে ৮৪, ৭৩২.১৬ কোটি টাকা। কিন্তু সেই আয়ের তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই সবশেষে মনে প্রশ্ন থেকেই যায়, বাজেটে উল্লেখিত জনপ্রিয় সব যোজনা, ঘোষণাগুলি কেমন করে বাস্তবে কার্যকর হবে। আদৌ রূপায়ণ হবে তো? আর যদি অসম সরকার বাজেটের প্রস্তাবিত সব যোজনাগুলি বাস্তবে কার্যকরী করে নেয় তবে অসমের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাবে। ফলে এক সোনার অসম গড়ে উঠবে। ■

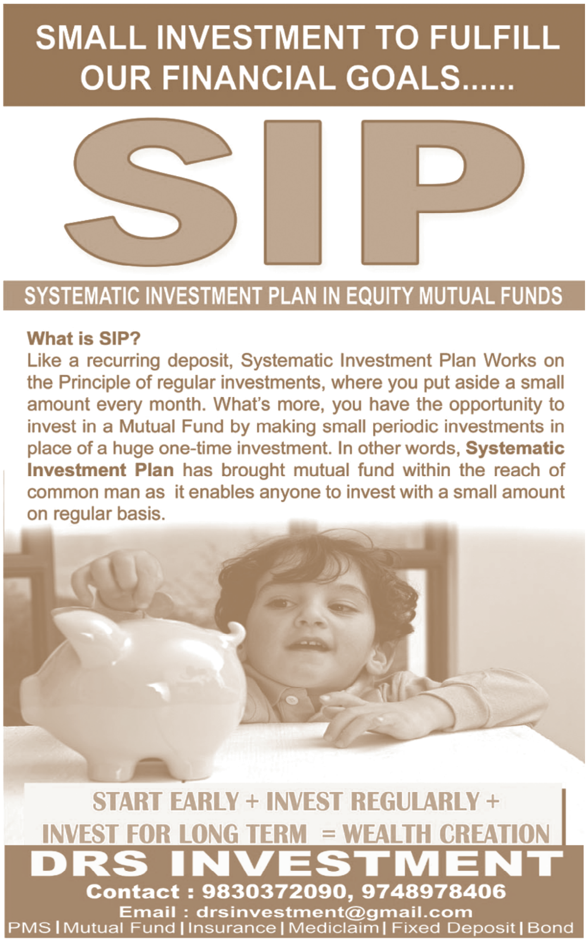

আন্তর্জাতিক

ভারত-বিরোধী পাক-চীন ষড়যন্ত্র

রাশিয়ার শামিল হওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে ২০১৬-র শেষের সুরটা যথেষ্ট উদ্বেগের। কেননা তার তান বাঁধা ছিল চীন-রাশিয়ার অশুভ আঁতাতের সুরে। চীন-রাশিয়ার বন্ধুত্ব শুধুমাত্র কূটনৈতিক সমঝোতার স্তরেই থেমে নেই, বরং ইদানীং এই দুই বড় শক্তি তাদের মিত্রতার বাতাবরণকে কাজে লাগিয়ে এশিয়া মহাদেশে ভারতের উত্থানকে রুখতে চাইছে। এর একটা হাতেগরম প্রমাণ হলো, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া সাংহাই কোঅপারেশান অর্গানাইজেশনে (এসসিও) ভারতের সদস্যপদ আটকাতে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। একইভাবে তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করে পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠীতে (এনএসজি) ভারতকে সদস্য হতে দেয়নি। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এশিয়া ও ইউরেশিয়া উপমহাদেশে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়াকে বানচাল করতে চীন কখনও আড়ালে, কখনও খোলাখুলি ভাবে রাশিয়ার হাত ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের চিরাচরিত আগ্রাসন নীতি আর এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে সামরিক প্রভুত্ব বাড়ানোর ফলে আজ এশিয়ার সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে। চীনের সঙ্গে অতীতের অস্বস্তিকর সম্পর্ককে পেছনে ফেলে রাশিয়া এখন চীনকে এশিয়া ও ইউরেশিয়ায় নাক গলানোর বড় সুযোগ করে দিচ্ছে। আরও উদ্বেগের কারণ হলো, পাকিস্তানের মতো একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র এই দুই বড় শক্তির জোটে ঢুকে একটা অশুভ আঁতাত গড়ে তুলছে। চীন-রাশিয়ার কূটনীতিক সমঝোতা শুধুমাত্র মধ্য এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই, এখন তা পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়াতেও বেড়ে চলেছে।

এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অনৈতিকভাবে এলাকা দখল করে, রাস্তা বানিয়ে চীন তার প্রভুত্ব কায়েম করছে। প্রাচীন ‘সিল্করুট’-এর জিগির তুলে তার গুণকীর্তন করা চীনের এই আগ্রাসন নীতির একটা নমুনা। চীনের এ ধরনের মানসিকতা কিন্তু অল্প দিনেই এশিয়ার সুস্থিতিকে এলোমেলো করে দেবে। ২০১৬-র নভেম্বরেই চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক বারান্দা (সিপিইসি)-র উদ্‌ঘাটন হয়েছে। এই প্রকল্পে রাশিয়াও যোগ দিচ্ছে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেখানে মস্কোর নীতি নির্ধারকরা পাকিস্তানকে ‘মৌলবাদের উপকেন্দ্র’ বলত, আজ তাদের সঙ্গেই রাশিয়ার বন্ধুত্ব স্থাপন নিয়ে বিশ্বের কূটনৈতিক মহলে উদ্বেগ শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি প্রভাদা-রু নামে একটি রুশ সরকারি সংবাদ মাধ্যমেও পাক-রাশিয়ার এই বেড়ে চলা বন্ধুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে আরব সাগরে এই দু'দেশের দু'টি যৌথ নৌমহড়াও হয়ে গেছে। পাকিস্তানকে নিয়ে রাশিয়ার এই বদমতলব নিয়ে সরব হয়েছেন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক এক রুশ কূটনীতি বিশেষজ্ঞ। ‘রাশিয়া-পাক ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতা নয়াদিল্লিকে ভয় দেখাচ্ছে’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি রাশিয়ার নীতি নির্ধারকদের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন যে, ‘পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনী রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতার ফল ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে না এই নিশ্চয়তা কীভাবে রাশিয়া দিল্লিকে দেবে?’ বেশ কিছুদিন ধরে ভারতের প্রতি পাকিস্তানের বেপরোয়া আগ্রাসী মনোভাবের মধ্যে এই রুশ পণ্ডিতটির প্রশ্নের যথার্থতা

রাশিয়া-পাকিস্তান মিলিটারির যৌথ মহড়া।

মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ এবং অবশ্যই রাশিয়ার সঙ্গে ভারত সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। কিন্তু সবার আগে রাশিয়াকে তার ভারত-বিরোধী বিদেশনীতি থেকে সরে আসতে হবে।

খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের সীমানা বরাবর রাশিয়া-পাক যৌথ মহড়ার পাশাপাশি গত কয়েকমাসে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম চীনের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সিপিইসি-তে রাশিয়ার যোগ দেবার সম্ভাবনা নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের মন্তব্য করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক কিংবা সিপিইসি-তে যোগদানের খবর মস্কো লাগাতার ভাবে অস্বীকার করে চলেছে। পাকিস্তান থেকে পাওয়া খবরাখবর থেকে জানা যাচ্ছে যে চীনের সাহায্যে পাকিস্তানে গড়ে ওঠা বহুচর্চিত গদর বন্দরে রাশিয়া একটা পাকা জায়গা করে নিতে চায়। রাশিয়ার সরকারি সংবাদপত্র স্পুটনিক গত নভেম্বরে এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সিপিইসি-তে রাশিয়া যোগ দিতেই পারে। এতে ভারতের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বেড়ে চলা বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যদি রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত হয় তবে ভারতের যথেষ্ট মাথাব্যাথার কারণ থাকছে। রাশিয়া-চীনের কৌশলগত সন্ধি নিয়ে ভারত কিন্তু একেবারেই মুখ খুলছে না। আর ভারত-মার্কিন বন্ধুত্ব কখনোই রাশিয়াকে লক্ষ্য করে বেড়ে উঠছে না। রাশিয়ার সীমানা লাগোয়া কোনো জায়গায় ভারত- মার্কিন যৌথ মহড়া এখনও পর্যন্ত হয়নি। আর এই বিষয়টিই হয়তো নবনির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুশ রাষ্ট্রপতি পুতিনকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। ২০১৪-তে ক্রিমিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থান করে ইউক্রেনকে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার সময় যখন রাশিয়া আন্তর্জাতিক মহলে কোণঠাসা ছিল, সেসময়ও ভারত রাশিয়ার সঙ্গেই ছিল। অন্যদিকে রাশিয়া ভারতের স্থায়ী সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও সে তার অঙ্গীকার থেকে সরে আসছে। নিজের দেশেই মুসলমান মৌলবাদী শক্তির তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রাশিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে মাখামাখি করছে। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় অশান্তি পাকানো, চেক মৌলবাদীদের সমর্থন দেবার মতো পাকিস্তানের নিন্দাজনক আচরণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার নীতি নির্ধারক থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা লাগাতার প্রতিবাদ করছেন। আর যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে সুস্থিতি ফেরানোর নামে রাশিয়া তালিবান উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে— এই খবরটা যদি সত্যি হয় তবে তা চূড়ান্ত অবাক করে দেবার মতোই ঘটনা হবে। একইভাবে চীন তার জিনজিয়াং প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইসলামি জেহাদিদের নাশকতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সুবিদিত মাসুদ আজাহারদের মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে চলেছে। ভারতকে জব্দ করতে চীন সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে পাকিস্তানের জঘন্য ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করছে। এ সমস্ত বিষয়ই এশিয়ার নিরাপত্তার উপর গভীর ছায়া ফেলছে। আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডরের (আইএনএসটিসি) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাশিয়ার তো উচিত কীভাবে ওই প্রকল্পকে আবার চাঙ্গা করে তোলা যায় তার চেষ্টা করা। ভারত-রাশিয়া-ইরান এবং ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জল-সড়ক-রেলপথে পণ্য আদান-প্রদান বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভারত ও ইরান এশিয়া-ইউরোপের অন্য দেশগুলির সঙ্গে পরিকাঠামোগত সংযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারত। এটা সিপিইসি-র থেকে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় প্রকল্প। আসলে রাশিয়ার গত দু'দশকের বিদেশনীতি দেখলে দেখা যাবে যে তারা এশিয়া মহাদেশে চীনের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করছে। চীনের সিপিইসি, 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'— এসব উদ্যোগ এই নীতিরই অংশবিশেষ। একইভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার সখ্যের কারণে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছচ্ছে। রাশিয়ার এই আত্মঘাতী বিদেশনীতির অপবাদ মুছতে তার যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়া দরকার। সর্বোপরি, ভারতকে আটকাতে চীনের ষড়যন্ত্রে পা দেবার পর রাশিয়ার তালিবান সংযোগ ভারত-সহ এশিয়ার নিরাপত্তার উপর গভীর সঙ্কট তৈরি করছে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো যে, চীনের পক্ষ নিয়ে রাশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে শক্তির ভরকেন্দ্র করে তুলতে চাইছে।

একটি ইউরেশিয় রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও অবস্থানগত কারণের জন্য এশিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে রাশিয়ার গভীর স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের আগ্রাসনকে মদত দেবার ফলে ভিয়েতনামের মতো দ্বীপ-রাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সুসম্পর্ক আজ প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। রাশিয়া জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে চাইলেও জাপানের তরফ থেকে খুব একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

অর্থনীতি ও সামরিক দু'দিক থেকেই ভারত এখন এশিয়ার অন্যতম উদীয়মান শক্তি। এই শক্তির কাণ্ডারি হিসেবে নরেন্দ্র মোদী এশিয়ার শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে বেশ সদর্থক ভূমিকাই নিয়ে চলেছেন।

ভিয়েতনাম, জাপান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ এবং অবশ্যই রাশিয়ার সঙ্গে ভারত সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। কিন্তু সবার আগে রাশিয়াকে তার ভারত-বিরোধী বিদেশনীতি থেকে সরে আসতে হবে। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

অন্য রকম

আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর

সরস্বতী রাজামণি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাবা-মা মেয়ের নাম রেখেছিলেন রাজামণি। কিন্তু নেতাজী ডাকতেন সরস্বতী বলে। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব জেদি। একবার যেটা করবেন বলে ঠিক করেন, করে ছাড়েন। ১৬ বছরের রাজামণির জেদের কাছে হার স্বীকার করেছিলেন স্বয়ং নেতাজীও। তিনি রাজামণিকে আজাদ হিন্দ ফৌজে শামিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে বয়েসে মেয়েদের স্বামী-সংসারের স্বপ্ন দেখার কথা সেই বয়েসে তিনি তাঁর স্বপ্নের নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর হয়েছিলেন।

সরস্বতী রাজামণির জন্ম বর্মামুলুকে, ১৯২৭ সালে। বাবা ছিলেন ত্রিচির ধনী খনি ব্যবসায়ী। কিন্তু সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্ধ সমর্থক হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন এড়াতে তিনি সপরিবার বর্মায় থাকতেন।

রাজামণি বড়ো হচ্ছিলেন খুবই উদার পরিবেশে। বড়ো হবার পর তিনি নেতাজী এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা জানতে পারেন। যেহেতু তিনি ছোটবেলা থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, তাই নেতাজীর তেজোদ্দীপ্ত নেতৃত্ব এবং আগুন ঝরানো কথাবার্তা তাঁকে দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করতে সহজেই উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। এখনও, নব্বই উত্তীর্ণ রাজামণি যখন নেতাজীর স্মৃতি রোমন্থন করেন তাঁর চোখ আনন্দে উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে। অনর্গল বলে চলেন নেতাজীর কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন আগে নেতাজী বর্মায় গিয়েছিলেন। গান্ধীজী বা অন্যান্য কংগ্রেস নেতার মতো অহিংসার কথা না বলে স্বাধীনতার জন্য প্রতিটি দেশবাসীকে অস্ত্র তুলে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রাজামণি। এক মুহূর্ত দেরি না করে তাঁর যাবতীয় অলঙ্কার দান করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলে। এত বড়ো একটি ঘটনা নেতাজীর নজর এড়ায়নি। খোঁজখবর করে তিনি জেনেছিলেন, রাজামণি বর্মায় বসবাসকারী এক ধনী ভারতীয় পরিবারের সন্তান। পরের দিনই তিনি রাজামণির বাবার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, 'ছেলেমানুষী করে ও সব গয়না দিয়ে দিয়েছে। তাই আমি ওগুলো ফেরত দিতে এলাম।' রাজামণির বাবাও আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলে নিয়মিত দান করতেন। নেতাজীর কথায় তিনি শুধু হেসেছিলেন। রাজামণি বলেছিলেন, 'ওগুলো বাবার কিনে দেওয়া নয়, আমার। আমার গয়না আমি দিয়েছি, কিছুতেই ফেরত নেব না।' কিশোরী রাজামণির এই দৃঢ়তায় নেতাজী মুগ্ধ হন। ওই দিনই রাজামণি ফৌজে যোগ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নেতাজী আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু এবারও জয়ী হয় রাজামণির দৃঢ়তা। পরের দিন রাজামণি এবং তাঁর চার বন্ধুকে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

ছেলে সেজে রাজামণি ও তার বন্ধুরা ব্রিটিশ সৈন্যশিবির এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বাসস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। সংগ্রহ করতেন নানা গোপন খবর। দু' বছর ধরে চলেছিল এই প্রক্রিয়া। নেতাজীর নির্দেশ ছিল যথেষ্ট সাবধানতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। কেউ যেন ধরা না পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন ধরা পড়ল। রাজামণি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি বন্ধুকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করে আনবেন। নর্তকী সেজে তিনি ব্রিটিশ গুহায় ঢুকেছিলেন। ছাড়িয়েও এনেছিলেন বন্ধুকে। পালাবার সময় এক ব্রিটিশ সৈন্যের ছোড়া গুলি তাঁর পায়ে এসে লাগে। এখনও তার জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কিন্তু কেউ সহানুভূতি দেখালে রেগে যান। মেরুদণ্ড সোজা রেখে গুলির চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, 'এই চিহ্ন আমার লড়াইয়ের স্মৃতি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।' ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

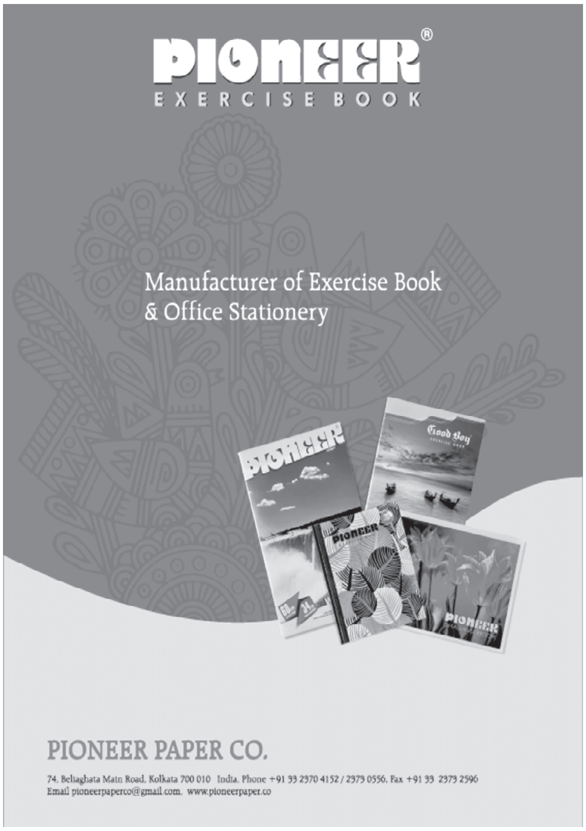

"এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে পরিণত করেছে কর্মের মহান প্রচারকরূপে। তবে এই কর্মজ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তার প্রকাশক। তাঁর নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত— সাধুর কুটিয়া ও মন্দির দ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁর নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোনো প্রভেদ নেই। পৌরুষে ও বিশ্বাসে— যথার্থ ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো পার্থক্য নেই।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বকফুল ও কাঁচা পেঁপের উপকারিতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বকফুলের কচি শুঁটি সবজি হিসেবে বেশ উপকারি। দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদন এতে অধিক পরিমাণে মজুত আছে। শুঁটিতে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকায় এটি দাঁত ও হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে। আবার ভিটামিন 'সি' থাকায় এটি দেহে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তাল্পতার মতো সমস্যায় নিয়মিত ফুল ও শুঁটি সবজি হিসেবে খেলে উপকার পাবেন। তুলনামূলক ভাবে অনেক কম খরচেই এটি পেতে পারেন। আবার ফুল ও শুঁটিতে থাকা আঁশ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত লোকের শরীরের মধ্যে গ্লুকোজ সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং খাদ্যনালীতে ক্যান্সার রোগের আক্রমণ ঠেকায়। বকফুল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এর শুঁটি বা ফল হল আয়োজিন নামক খনিজ উপাদানের অন্যতম প্রধান উৎস। আয়োডিন থাকার কারণে এটি গলগণ্ড রোগের আক্রমণ ঠেকায়।

কাঁচা পেঁপে

- ১০ ফোঁটা করে কাঁচা পেঁপের দুধ বা আঠা প্রতিদিন অল্প জলে মিশিয়ে খেলে দাদ ও চর্মরোগ সারে, কৃমি নাশ হয়।
- প্রতিদিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর এবং রাত্রে ভাত বা রুটি খাওয়ার পর এক টুকরো কাঁচা পেঁপে ভাল চিবিয়ে খেয়ে ১ গ্লাস জল খেলে সকালে পেট পরিষ্কার হয়। এতে অম্বল ও বদহজমের কষ্টও দূর হয়।
- দুই চা চামচ কাঁচা পেঁপের আঠা ২ চা চামচ চিনি মিশিয়ে কিছুদিন ধরে দিনে তিন বার করে খেলে পিলের আয়তন ক্রমশ কমে যায়।
- দু' চা চামচ পেঁপের আঠায় ১ চা চামচ চিনি মিশিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে অম্বল ও অজীর্ণ রোগে উপকার হয়।
- যেসব মায়ের সদ্য শিশু হয়েছে, কাঁচা পেঁপের তরকারি নিয়মিত খেলে তাঁদের স্তনের দুধ বাড়বে।
- পিলে ও লিভার বেড়ে যাওয়া, তার সঙ্গে জ্বর ও দুর্বলতার ওষুধ হিসেবে দিনে ও রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিয়মিত ৫/১০ ফোঁটা করে পেঁপের আঠা খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- ওষুধ হিসেবে কাঁচা পেঁপের গুণ পাকা পেঁপের চেয়ে বেশি হয়। পেপটিন বা পেঁপের আঠার গুণ অশেষ।
- বড় কাঁচা পেঁপে চিরে নিয়ে তার নীচে একটি কাপ বা ডিশ রাখুন। এইভাবে দুধ বের করে নিন। এই দুধ বা আঠা তৎক্ষণাৎ রোদ্দুরে শুকিয়ে নিন। এই আঠা গুঁড়ো করে শিশিতে ঢাকনা বন্ধ করে রাখুন। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার জাতীয় অসুখে এই চূর্ণ ভাল ফল দেয়। পাকস্থলির দাহ, বায়ু গোল, ব্রণ, অম্লপিত্ত, বদহজম প্রভৃতি অসুখও এই চূর্ণ নিয়মিত খেলে সেরে যায়।
- আধ চামচ পেঁপের দুধ চিনি মিশিয়ে খেলে অজীর্ণতা সেরে যায়।
- কাঁচা পেঁপের বীজ কৃমিনাশক। এই বীজ খেলে মেয়েদের ঋতু নিয়মিত হয় এবং বেশি পরিমাণে খেলে গর্ভপাত হয়।
- পেঁপের পাতা জলে সেদ্ধ করে চায়ের মতো তৈরি করে খাওয়ালে হৃদরোগে উপকার পাওয়া যায়।

■

পরলোকে কোচবিহারের প্রবীণ স্বয়ংসেবক নির্মলকৃষ্ণ গোস্বামী

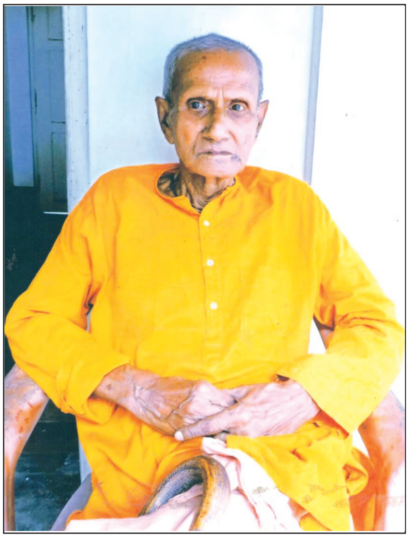

সাধন পাল।। গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ রবিবার সকাল ১০-৫৫ মিনিটে প্রয়াত হলেন শ্রীমৎ নির্মলকৃষ্ণ গোস্বামী। সাধুজী, সাধুমাস্টার ইত্যাদি নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। অকৃতদার। গেরুয়া পরতেন। কোনো আশ্রম বা স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু ছিল না। জীবনের শেষ কয়েক বছর কোচবিহার জেলার ডাকালীহাট এলাকায় দীক্ষিত শিষ্যদের বাড়িতেই বসবাস করতেন। বছর দুয়েক হবে বার্ধক্যজনিত কারণে চলাফেরা কমে গিয়েছিল। সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শ্রীদাম পাল নামে শিষ্যের বাড়িতে। সঙ্ঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিদ্যাভারতীর স্থানীয় কার্যকর্তাদের পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। জনৈক শিষ্যের দেওয়া তথ্য অনুসারে জন্ম ১৯১৩ সালে। অবিভক্ত ভারতের ঢাকা শহরে। পিতা জগৎবন্ধু গোস্বামী। মাতা মহামায়া দেবী। লেখাপড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তুফানগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১৯৫৯ সালে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের এক শ্মশানঘাটে মৌনব্রত পালন রত অবস্থায় তিনি সর্বপ্রথম স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু দিলে খেতেন, না দিলে না খেয়েই দু-তিন দিন কাটিয়ে দিতেন। ১৯৬০ সালে তুফানগঞ্জেরই পালিকার মেলা এলাকার কালীমন্দিরে একইরকম ভাবে সাধারণ অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়। তুফানগঞ্জের বিশিষ্ট রাজনীতিক সুরেন রায় কোঙার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ১৯৬১ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম কৃষ্ণপুরে তাঁরই শ্যালক নরেন বর্মনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় প্রথম পরিচয় হয় সাধুজীর সঙ্গে। গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারা শিক্ষিত সপ্রতিভ সাধু হিসেবে নজর কাড়েন সহজেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্মৃতিচারণায় এই বছরই তুফানগঞ্জেরই উল্লার খাওয়া ঘাটে সাধুজীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রভাবী ধর্মসভার কথাও জানা গেল। এই বছরই তুফানগঞ্জের শালবাড়িতে সুরেন রায় কোঙারের বাড়িতে পদার্পণ করেন। এই বাড়িতেই প্রথম দীক্ষা নেন সুরেনবাবুর দাদা সতীশ রায় কোঙার। দীক্ষা নেন সুরেনবাবু নিজেও। এর পর তুফানগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় দীক্ষা দিয়ে সংখ্যাগত দিক দিয়ে সমীহ করার মতো এক শিষ্য-সমাজ গড়ে তোলেন। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সুরেনবাবু বলেন, দুর্দিনে ঘটিবাটি বেচে তুফানগঞ্জ বিধানসভায় ভারতীয় জনতাপার্টির হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর পিছনে গুরুদেবই ছিলেন মূল প্রেরণার উৎস।

১৯৬৪ সালের কোনো এক সময় কোচবিহার জেলার ডাকালীহাটে স্থানীয় একটি হরিমন্দিরে মৌনব্রত পালন ও সাধনায় বসেন। স্বাভাবিক ভাবেই এখানেও অনেকের নজরে আসেন এবং দীক্ষা দিয়ে বেশ বড়সড় এক শিষ্য সমাজ গড়ে তোলেন। সে সময় শিক্ষকতা করার মতো যোগ্য শিক্ষিত মানুষের অভাব ছিল। স্থানীয় নগর ডাকালীগঞ্জ জুনিয়ার হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ওই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। গেরুয়া পরিহিত শিক্ষককে স্থানীয় মানুষ সাধুমাস্টার নামে ডাকতে শুরু করলেন। সাধুমাস্টারের এক ছাত্র লক্ষপতি প্রামাণিক বর্তমানে মাথাভাঙ্গা পৌরসভার পৌরপতি। পৌরপতির স্মৃতিচারণায় জানা গেল যে, সাধুজী স্কুলে সমস্ত বিষয়ই পড়াতেন। বিনামূল্যে টিউশনও পড়াতেন।

ঠিক কোন সময় কীভাবে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন এটা জানা না গেলেও অনেকের স্মৃতিচারণায় এটা উঠে এল যে, ১৯৭২-৭৩ সালে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের শালবাড়িতে নিয়মিত সঙ্ঘের শাখায় যেতেন। ২৫ জুন ১৯৭৫ ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলে তিনি সঙ্ঘের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যাগ্রহে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৪ নভেম্বর ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগেই রায়ডাক নদীর তীরে স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের নিয়ে শাখা করেন। শাখা থেকে ফিরে শালবাড়িতে সবাইকে ডেকে বৈঠক করেন এবং সেদিনই তুফানগঞ্জ কোর্ট চত্বরে সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হন। কুখ্যাত মিশায় আটক হয়ে ১৯ মাস জেল খাটেন।

জরুরি অবস্থার পর সাধুজীর হাত ধরেই এই জেলার ডাকালীহাটে সঙ্ঘকাজ শুরু হয়। জরুরি অবস্থার পরে কোচবিহারে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় বালাসাহেব দেওরস কোচবিহারে আসেন। সেসময় দেওরসজীর কার্যক্রমে ডাকালীহাট থেকে ছয়-সাতজন বালককে তিনি কোচবিহারে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমিও তার মধ্যে ছিলাম। এরপর এই এলাকায় সঙ্ঘকাজ শুরু করার জন্য তুফানগঞ্জ থেকে শ্রীধর কোঙারকে বিস্তারক হিসেবে ডাকালীহাটে এনে রেখেছিলেন। উল্লেখ্য, জরুরি অবস্থার সময় সত্যাগ্রহ করার সময় শ্রীধরদা তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ১৯৭৮ সাল থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যোজনায় তিনি হাতিপোতা শিবমন্দিরে ছিলেন বেশ কয়েক বছর। আমুদে, উৎসাহী, বিপদের বন্ধু, ব্যতিক্রমী পথপ্রদর্শক হিসেবে হাতিপোতার মানুষ এখনো তাঁকে স্মরণ করে। এলাকায় তাঁর নেতৃত্বে পরাবর্তনের মাধ্যমে খ্রিস্টান থেকে হিন্দুধর্মে ফিরে আসার ঘটনাও কয়েকজনের স্মৃতিচারণায় উঠে এল। সাধুজীর প্রয়াণে কোচবিহার জেলার সঙ্ঘকাজের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো, সেই সঙ্গে স্বয়ংসেবকরা হারালো এক অভিভাবককে।

চাঁচল শিশুমন্দিরে ‘শিশুবিচিত্রা’

মালদা জেলার চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পরিবেশন করে তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘শিশু বিচিত্রা’। শিশুদের আবৃত্তি, গান, নৃত্য, যোগব্যায়াম ও নাটক সকলকে মুগ্ধ করে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাই গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থানাধিকারী সুবর্ণ মণ্ডলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানন্দটোলা কাটাহা দিয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কুলদা চরণ সিংহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ কার্যবাহ তথা পাঁচকড়িটোলা মালদা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামেশ্বর পাল।

সিউড়িতে ভরতমুনি স্মরণ অনুষ্ঠান

বিশ্বের প্রাচীনতম আকরগ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। সেই নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনিকে স্মরণ করল সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কারভারতীর সিউড়ি শাখা।

দেশ জুড়ে সংস্থার সমস্ত শাখায় একযোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ভরতমুনি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তারই অঙ্গ স্বরূপ সিউড়িশাখার পক্ষ থেকে নাট্য আলোচনা,

শ্রুতিনাটক, নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতাকে স্মরণ করা হয়। পরিবেশিত নাটক ‘ধর্মাধর্ম’। এছাড়া সংস্কারভারতীও সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশিত হয় নাট্যাভিনয়— ‘রাঢ়ভূমে শ্রীচৈতন্য’। সংস্থার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী জানান, সংস্কারভারতী দেশ জুড়ে ভরতমুনি স্মরণ করে প্রতি বছরের নির্দিষ্ট দিনে। তারই অঙ্গ স্বরূপ সিউড়ি শাখার পক্ষ থেকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় নাট্যশাস্ত্র প্রণেতাকে।

সমাবেশ সমাচার

আমতায় ভারতমাতা পূজা

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গত ২৬ জানুয়ারি থেকে হাওড়া জেলার আমতায় বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে চারদিন ধরে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় সংস্কার ভারতী, সংস্কৃতভারতী ও মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমদিন পূজার্চনা ও সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা ও রাজ্যস্তরের কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এদিন ‘পুণ্যভূমি ভারত’ বিষয়ে সংস্কৃতভারতীর প্রণব নন্দ এবং ‘সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্কার ভারতীর সুভাষ ভট্টাচার্য। সন্ধ্যায় আমাদের দেশের শহিদ জওয়ানদের স্মরণে ১৮০১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এলাকার মানুষ।

দ্বিতীয় দিন শান্তিযজ্ঞ ও নরনারায়ণ সেবায় আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় সেবা ও সাধনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিবশঙ্কর বেজ। তৃতীয় দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। চতুর্থদিন স্থানীয় শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। চারদিনই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য দিব্যেন্দু চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের সভাপতি অসিত মণ্ডল।

মঙ্গলনিধি

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রদেশের সহ-সম্পাদক তথা বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি গ্রামের স্বয়ংসেবক অরুণ কুমার মণ্ডল তাঁর পুত্র পুরুযোত্তম মণ্ডলের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে গত ৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলনিধি প্রদান করেন খাতড়া মহকুমার পূর্বতন কার্যবাহ রবীন্দ্রনাথ পাত্রের হাতে। অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলার বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক কাজে সিউড়ি সংস্কারভারতী

শুধু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না সংস্কারভারতীর সিউড়িশাখা। তাই গত ১৪ ডিসেম্বর দূর-পাল্লার ট্রেনের স্টপেজের জন্য জেলা শহর সিউড়ি স্টেশনে পূর্বরেলের

চিফ জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দাবিসনদ্ পেশ করে। সাংস্কৃতিক সংগঠনের এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই একাধিক দাবি পূরণ করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

এছাড়াও সিউড়ি শাখা গত তিন মাসে নানা জায়গায় আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে জনস্বাস্থ্য সমিতির আমন্ত্রণে পরিবেশন করে রাইকৃষ্ণ পদাবলী। শ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের আমন্ত্রণে নিবেদিত হয়— 'লোকমাতা নিবেদিতা' গীতিআলেখ্য। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে 'নির্মল বাংলা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত এবং বীরভূম জেলা গ্রন্থমেলায় গীতিআলেখ্য-লোকমাতা নিবেদিতা পরিবেশিত হয়। কড়িধ্যা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মোৎসবে রাইকৃষ্ণপদাবলী, বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলায় 'গঙ্গাঅবতরণ' নৃত্যালেখ্য দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

গো-রক্ষা সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গো-রক্ষা বিভাগের ভারতীয় গো-বংশ রক্ষণ সংবর্ধন পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় গো-রক্ষা আন্দোলন সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠক গত ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্র সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি, ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক, সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহিলা সহ-সভানেত্রী, প্রান্ত মহিলা সদস্যা, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং গো-বিজ্ঞান-পরীক্ষা প্রমুখেরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে ৩০০ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের তিন সমিতি থেকে তিন সভাপতি— অবরসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গোপীনাথ দে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার শাখার ম্যানেজার তারকেশ্বর দাস-সহ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবরসরপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান ড. মাধবমোহন অধিকারী, সহ-সভাপতি প্রান্ত মাতৃশক্তি প্রমুখ ডাঃ মায়া মাইতি, গ্রামীণক্ষেত্রে গো-আধারিত জৈবিক কৃষির সঙ্গে ওতপ্রতভাবে যুক্ত শ্রীমতী সনকা সী, রেলওয়ের সদ্য অবসর প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার সম্পাদক প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গো-বিজ্ঞান পরীক্ষা জেলা সংযোজক প্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্তিক চক্রবর্তী, প্রান্ত পশু চিকিৎসক প্রমুখ এবং পশু পালন ও চিকিৎসা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত জেপুটি ডাইরেক্টর ডাঃ জয়দেব দীর্ঘাঙ্গী, গো-রক্ষা বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অঞ্জন কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক অভিজিৎ মহন্ত'র বাবা নন্দ মহন্ত গত ৪ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা এবং নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত
সদ্য প্রকাশিত বই

মুসলমান সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ এবং তার ভয়াবহ পরিণাম

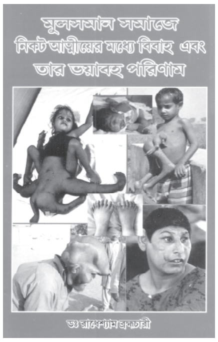

—: প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান :—
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩

মূল্য ২০ টাকা মাত্র

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা থেকে 'জল দাও'

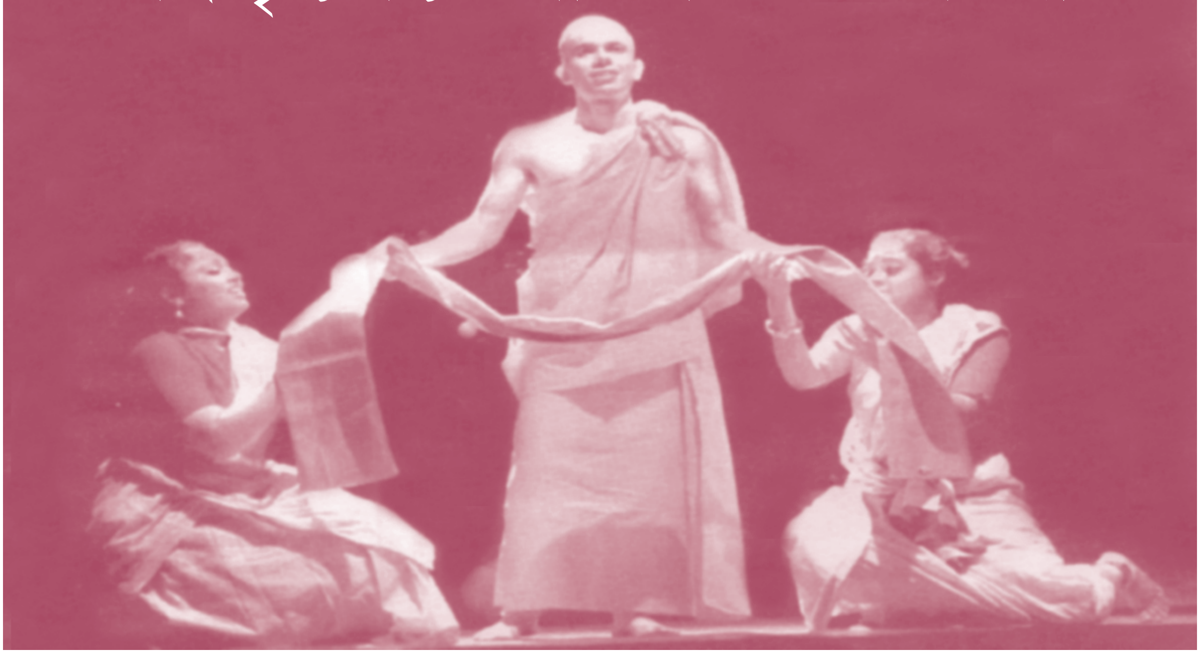

বিকাশ ভট্টাচার্য

নাট্যপ্রহরী সম্প্রতি অভিনয় করছে স্বল্প দৈর্ঘের নাটক 'জল দাও'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা অবলম্বনে নাট্যকার মৈনাক সেনগুপ্ত রচনা করেছেন এই নাটক। মৈনাক সেনগুপ্ত ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন। রবীন্দ্রভাবনাকে সমকালীন ভারতবর্ষের জাতি-বৈষম্যের পটভূমিতে নিয়ে এসেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে এভাবেই শ্রদ্ধা জানালেন নাট্যকার।

স্বাধীনতার এতো বছর পরে এখনও আমাদের দেশে তথাকথিত জমিদার-মহাজনের দাপট অব্যাহত। উচ্চবর্ণের মানুষ ছোটকর্তা নিম্নবর্গের প্রকৃতি ও তার মা মায়াদের সেই শ্রেণী বৈষম্যের জোরেই প্রকৃতির দেওয়া সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে চলে, এমনকী প্রকৃতির দেওয়া জলেও তাদের অধিকার নেই (গ্রামের ছোটকর্তা তার কূয়ো থেকে এই সব ছোটজাতের মেয়েদের জল তুলতে বাধা দেয়)। নাট্যকার এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভারত থেকে একুশ শতকের ভারতবর্ষে পৌঁছেছেন। এই যুগের আনন্দ প্রকৃতির অন্তরের মানুষকে যেমন সম্মান জানিয়েছে, তেমনি প্রতিবাদও করেছে ছোটকর্তার অমানবিকতার বিরুদ্ধে। নাট্যকার এখানে প্রকৃতির ভয়ভাঙা মেজাজের কথাও বলেছেন। এই মাটির কন্যা প্রকৃতি যেন মাথা উঁচু করে সমস্ত পীড়িত মানুষের হয়ে এক অন্য বার্তা পৌঁছে দিয়েছে আগামী প্রজন্মের কাছে। নাট্যপ্রহরীর প্রযোজনা ও পুলক রায়ের নির্দেশনায় কোনো আড়ম্বর নেই। একদিকে তা ভালোই হয়েছে।

উদিতা মৈত্র হয়েছেন প্রকৃতি ও কৃষ্ণা রায় মা মায়া। এঁরা দুজনেই যথাযথ। সুমন রায়কে ছোটকর্তা মানিয়ে গেছে। সুব্রত সাধুখাঁ অভিনয় করেছেন আনন্দের ভূমিকায়। তাঁর অভিনয় নজর কাড়ে। ফুলওয়ালা, দইওয়ালা ও চুড়িওয়ালা করলেন যথাক্রমে প্রীতম সরকার, রাকেশ সাহা ও সঞ্জয় বটব্যাল। অপূর্ব এদের চরিত্রানুগ অভিনয়। সঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। আবহে নীরবতার জায়গাই বেশি। গান ছাড়া কী এ নাটক মানায়। বিশেষ করে হাতের কাছে 'আমি তোমারই মাটির কন্যা' বা 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' আছে। অন্তত সুরটুকু আবহে দেওয়া যেত। অতনু সরকারের আলো কোনো বিশেষ মাত্রা যোগ করেনি। তেমনি মঞ্চ একেবারে সাদামাটা। তবে উদ্যোগ প্রশংসীয়।

কুমার রায় স্মৃতি সম্মান ২০১৭

শম্ভু মিত্রের যোগ্য উত্তরসূরী প্রয়াত কুমার রায় স্মরণে বিগত ছয় বছর ধরে তাঁর নামে তিরিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। যেসব নাট্যদল কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুদান ছাড়াই নিয়মিত নাট্যচর্চা করে চলেছে বা নাট্যপত্র বা পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে—এমন সংগঠনের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শব্দরূপ-৮২৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

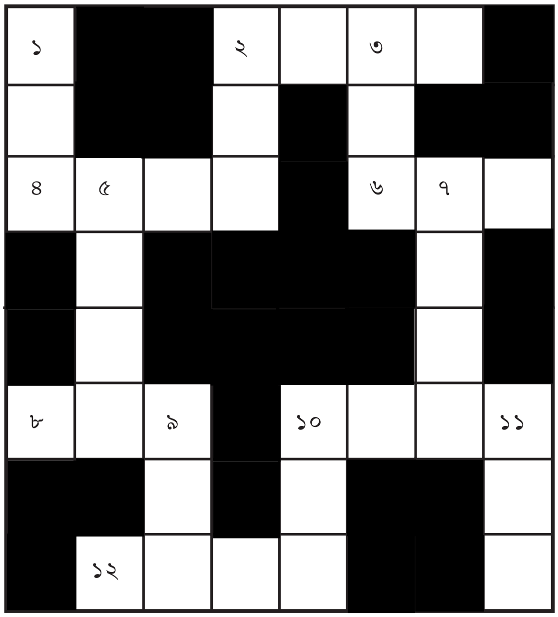

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. বিবাহের পর ছায়ামণ্ডপ হতে বরবধূর সাত পা গমন, ৪. পুরোণোক্ত নরকবিশেষ, ৬. তপস্বী, মুনি, ৮. ধাতুনির্মিত বাসন ইত্যাদি, **১০.** জনবিরল বিশাল প্রান্তর, **১২.** গৃহশোভার জন্য বৃক্ষকে বামন করে রাখার পদ্ধতি।

উপর-নীচ : **১.** আয়ুর্বেদ রচয়িতা প্রাচীন পণ্ডিত বিশেষ, ২. ‘‘আমার —রসের ধারা/তোমাতে আজি হোক না হারা’, ৩. উপবীত; উপনয়ন, ৫. নিষ্কর, ৭. শুভলক্ষণমূলক; ভাগ্যবান, ৯. আদালতে উপস্থিত হওয়ার পরোয়ানা, **১০.** (সংগীতে) সম বা তাল শেষ করবার পূর্বে মৃদঙ্গাদিতে তিনবার আঘাত, **১১.** পদ্ম-পুরাণোক্ত মনসাদেবীর গীত।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২১
সঠিক উত্তরদাতা
দীপক রঞ্জন দাস
জোড়াঘাট লেন,
চুঁচুড়া, হুগলী
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

		ভা	শু	র	পো		দ্বা
সো	পা	ন			লি		প
	ক		বে		ও	জ	র
	শা	দূ	ল			র	
	স			ম	রু	ৎ	
বি	ন	তা		ল্ল		কা	
জ		মা			মা	রু	তি
য়া		শা	স্তি	জ	ল		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

□ ৮২৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ মার্চ ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। ‘চিঠিপত্র’ **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু’টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২৩

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

নাথুরাম গডসের বক্তব্য প্রকাশ্যে আনার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নাথুরাম গডসে আদালতে যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন

তা প্রকাশ্যে আনার প্রস্তাব দিল জাতীয় তথ্য কমিশন। সেইসঙ্গে গডসে-সংক্রান্ত অন্যান্য বিচারবিভাগীয় নথিপত্রও প্রকাশ্যে আনার কথা বলেছে কমিশন। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য ওয়েবসাইটে তোলার জন্য জাতীয় আর্কাইভকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। তথ্য কমিশনার শ্রীধর আচারিউলু বলেন, নাথুরাম গডসের সমকালীন রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মতামত সকলের জানা উচিত। তাঁর মতে, 'নাথুরাম গডসের সঙ্গে কারও মতবিরোধ থাকতেই পারে কিন্তু তাই বলে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যা বলেছিলেন তা গোপন করা উচিত নয়।

ওড়িশার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ওড়িশার সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল এখনও পর্যন্ত যা জানতে পারা গেছে তাতে নাটকীয় পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। ওড়িশায় বিজেপি এই প্রথম অন্তত চারটি জেলা পরিষদের ক্ষমতা দখল করতে চলেছে। বিজেপির এই ঐতিহাসিক ফল চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেডি এবং তার সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়ককে। ২০১৯-এ ওড়িশায় বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি যদি এইভাবে রাজ্যে শিকড় ছড়াতে থাকে তাহলে বিধানসভা নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে তীব্র প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ার মুখোমুখি হবে নবীন পট্টনায়কের দল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ৫৩৭টি কেন্দ্রের ফল ঘোষিত হয়েছে। তার মধ্যে বিজেডি পেয়েছে ৩০০টি, বিজেপি পেয়েছে ১৮০টি আর কংগ্রেস পেয়েছে ৪০টি আসন। মোট আসনসংখ্যা ৮৫৩টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজেপি কালাহান্ডি, ময়ূরভঞ্জ, বারগড় এবং বালাঞ্জির জেলা পরিষদগুলি দখল করেছে। কালাহান্ডিতে তিন দফার নির্বাচনে বিজেপি ২৫টি আসন পেয়েছে। মোট আসন ৩৬টি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৮টি।

একদিনে সুপ্রিম কোর্টে ৫ জন বিচারপতি নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাতাশ বছরে এই প্রথম! একদিনেই পাঁচজন নতুন বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের জন্য নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের শপথগ্রহণও হয়ে গেল সম্প্রতি। এই নিয়োগের ফলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সংখ্যা দাঁড়াল ২৮। লক্ষ্যমাত্রা ৩১ থেকে যা মাত্রই তিন অঙ্ক দূরে।

সর্বোচ্চ আদালত সূত্রে জানা গেছে সঞ্জয় কিষাণ কওল, এম এম শান্তানাগোদর, আবদুল নজির, নবীন সিনহা এবং দীপক গুপ্ত বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৮৮ সালে একসঙ্গে একইদিনে (১৪ ডিসেম্বর) পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিনেমা হলে সিনেমা শুরু হবার আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করার পর সর্বোচ্চ আদালত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে দেশের স্কুলগুলিতেও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা বাজানো বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে।

সংসদ বিধানসভা আদালত-সহ যাবতীয় পাবলিক অফিসে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যাতামূলক করা সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলায় বাদী পক্ষের আবেদন নাকচ করে দিয়ে আর ভানুমতী, এম এম শান্তানাগোদর এবং দীপক মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ জানায়, আদালত দেশের স্কুলগুলিতে জাতীয় সঙ্গীত চালু করতে চায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারও স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার প্রচলন করতে চায়। অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতাগি ইতিমধ্যেই আদালতের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
27 February - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০্ টাকা ।।